অধ্যাত্ম সাধনায় কর্মহীনতা নয়

নিষ্কর্ম হবে না। আসক্তি থাকবে না কর্মের প্রতি এবং স্পৃহা থাকবে না কর্মের ফলপ্রাপ্তির প্রতি। অধ্যাত্ম সাধনায় কর্মযোগের এইটিই হল নির্দেশ। প্রস্তুত গ্রন্থটিতে স্বামী রামসুখদাস মহারাজ সেই বিষয়েই আলোচনা করেছেন। তাঁর মূল লেখা এবং প্রবচন হিন্দিতে। বর্তমান গ্রন্থে বাংলায় অনূদিত দশটি রচনা তাঁর লিখিত মূল গ্রন্থ **'সাধন-সুধা-সিন্ধু'** থেকে নির্বাচিত। স্বামী রামসুখদাস মহারাজের প্রণীত গ্রন্থসমূহের অনূদিত বাংলা গ্রন্থের সংখ্যাও অনেক। বর্তমান গ্রন্থটি একটি নতুন সংযোজন। আশা করা যায় অন্যান্য গ্রন্থের মতো এটিও আদৃত হবে।

বিজয়া দশমী ১৪১১ **ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়**

॥ শ্রীহরিঃ ॥

সূচিপত্র

সকলের অভিজ্ঞতার কথা

কোনো কিছু প্রাপ্তির জন্য 'নির্মাণ' করা হয়, আর নয়তো 'অন্বেষণ' করা হয়। সাংসারিক বস্তুগুলির জন্য নির্মাণ করা হয়ে থাকে এবং পরমেশ্বরের জন্য অন্বেষণ করা হয়। কারণ নির্মাণ সেই বস্তুরই করা হয় যা এখন নেই, কিন্তু যা বিদ্যমান রয়েছে তার জন্য অন্বেষণ করা হয়। নতুন বস্তু তৈরি করতে সময় লাগে, তার জন্য অভ্যাস, প্রয়াস করতে হয়। কিন্তু যা আগে থেকেই বিদ্যমান তার প্রাপ্তি তাৎক্ষণিক হয়ে যায়। কেননা তা স্বতঃসিদ্ধ। তাই তার প্রাপ্তির জন্য পরিশ্রম করবার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন কেবল সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া। সেদিকে দৃষ্টি দিলেই প্রাপ্তি হয়ে যাবে।

গীতায় বলা হয়েছে—

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ (১৩।৩১)

'অনাদি ও নির্গুণ হওয়ায় এই অবিনাশী আত্মতত্ত্ব শরীরে অবস্থান করলেও কিছু করে না, লিপ্তও হয় না।' তাৎপর্য হল, এর কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব (লিপ্যতা)-র অবিদ্যমানতা করতে হয় না। এর মধ্যে অকর্তৃত্ব এবং নির্লিপ্ততা স্বতঃসিদ্ধ। নিজেকে শরীরে স্থিত মানলেও এ কর্তা এবং ভোক্তা হয়ে যায় না। যে সময়ে এ নিজেকে শরীরস্থিত দেখে এবং মানে সেই সময়ও সে বাস্তবে শরীরে স্থিত থাকে না। কারণ হল, সূর্যের যোগ যেমন অমাবস্যার সঙ্গে হতে পারে না তেমনই চেতনের যোগ শরীরের সঙ্গে হতে পারে না। অতএব জড়ের সঙ্গে সংযোগ (শরীরে স্থিতি) কেবল চেতনের দ্বারা আরোপিত মান্যতা। মান্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়। নিজের মধ্যে কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব কেবল মান্যতা। মান্যতা দূর হলেই প্রাপ্তি। মান্যতাকে দূর করতে ক্রিয়ার (কিছু করা) প্রয়োজন নেই, যা প্রয়োজন তা হল ভাব (মানা)

এবং বোধ (জানা)।

ক্রিয়ার দ্বারা যা অভিজ্ঞতা হবে তা তত্ত্বের অনুভূতি নয়, কেননা ক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন বস্তুর সঙ্গেই যোগ হয়, অনুৎপন্ন তত্ত্বের অনুভূতি হয় না। অনুৎপন্ন তত্ত্বের অনুভূতি ক্রিয়াগুলি থেকে অসঙ্গ হলেই হয়ে থাকে। ক্রিয়ায় অর্থাৎ অভ্যাসে তত্ত্বজ্ঞান হয় না, একটি নতুন অবস্থারই সৃষ্টি হয়। যথা, দড়িতে যদি চলতে হয় তবে চলা অভ্যাস করলেই তা করা যাবে, নইলে পড়ে যাবে। দ্বিতীয় কথা, অভ্যাস যদি করতে হয় তাহলে পূর্বের অভ্যাস ত্যাগ করেই তা করতে হবে, যোগদর্শনে আছে—**'তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ'** (১।১৩) 'কোনো একটি বিষয়ে স্থিরতা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য বার বার প্রযত্ন করার নাম অভ্যাস।' অতএব যদি প্রযত্ন করতে চান তাহলে আগেকার প্রযত্ন ছেড়ে দিয়ে তারপরই অন্য প্রযত্ন করবেন। দ্বিতীয়টি ছেড়ে তৃতীয় প্রযত্ন করবেন। তাৎপর্য হল এই যে যখন আমরা নিজেদের জ্ঞানকে রদ করে দিই তখনই অভ্যাসের প্রয়োজন পড়ে, নইলে অভ্যাসের আর কী প্রয়োজন ?

এমন কোনো বছর, মাস, ঘন্টা, মিনিট এবং মুহূর্ত নেই যখন শরীরের পরিবর্তন বা বিয়োগ না হচ্ছে—এই অভিজ্ঞতা সকলেরই। কিন্তু এমন কোনো বছর, মাস, ঘন্টা, মিনিট এবং মুহূর্ত নেই যখন চেতন তত্ত্বের পরিবর্তন অথবা বিয়োগ হয়। অর্থাৎ চেতনতত্ত্বের নিত্য যোগ। এই চেতন তত্ত্বের নিত্য-স্থিতির অভিজ্ঞতাও সকলের আছে। যেমন, আজ আমি এই রকম রয়েছি, কিন্তু ছোটবেলায় আমি ওই রকম ছিলুম, ওইভাবে পড়াশোনা করতুম—এই কথা বলা মাত্র প্রমাণ হয়ে যায় যে শরীর, ক্রিয়া, পরিস্থিতি প্রভৃতি বদলে গিয়েছে, আমি বদলাইনি, আমি যেমনকার তেমনই আছি। শরীরাদির পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা সকলেরই আছে। কিন্তু স্বয়ং-এর পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা কারও নেই। জীব নিজের কর্মের ফলভোগ করবার জন্য চুরাশি লক্ষ যোনিতে গমন করে, নরকে এবং স্বর্গে যায়—এই কথা বলা মাত্র প্রমাণিত হয় যে চুরাশি লক্ষ যোনি দূর হয়ে যায়, নরক এবং স্বর্গ দূর হয়ে যায় কিন্তু স্বয়ং সেই একই থাকে। যোনি (শরীর) বদলে যায়, জীব

বদলায় না। জীব একই থাকে, তবেই না সে অনেক যোনি, বিভিন্ন লোকাদিতে যায়। ভগবানও অনিত্য পদার্থ ও ক্রিয়ার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিত্য তত্ত্বের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করার কথা বলেছেন—

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্॥

(গীতা ২।১২)

'কোনো কালে আমি ছিলাম না—এমন কথা নয়, অর্থাৎ আমি অবশ্যই ছিলাম, তুমি ছিলে না—এমন কথাও নয়, অর্থাৎ তুমিও অবশ্যই ছিলে আর এই রাজারা ছিলেন না—এমন কথাও নয় অর্থাৎ এই রাজারাও অবশ্যই ছিলেন ; এবং পরে আমি, তুমি আর এই রাজারা থাকবেন না—এমন কথাও নয় অর্থাৎ আমি, তুমি এবং এই রাজারা নিত্য থাকবেন।' তাৎপর্য হল এই যে, আমি কৃষ্ণরূপে, তুমি অর্জুনরূপে এবং এঁরা রাজারূপে আগেও ছিলেন না, পরেও থাকবেন না, কিন্তু আমরা সত্তারূপে (জীবমাত্র) আগেও ছিলাম এবং পরেও থাকবো। শরীর নিয়ে আমি, তুমি এবং রাজারা হলাম তিন, কিন্তু সত্তাকে নিয়ে আমরা হলাম এক।

এই দৃষ্টি আত্মতত্ত্বকে নিয়ে, শরীরাদিকে নিয়ে নয়।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

(গীতা ২।২২)

'মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র পরিধান করে, তেমনই দেহী (জীবাত্মা) পুরাতন শরীর ত্যাগ করে অন্য নতুন শরীরে চলে যায়।'

বস্ত্র অনেক, কিন্তু বস্ত্র পরিধানকারী একজনই। পুরাতন বস্ত্র ফেলে দিলে মানুষের মৃত্যু হয় না এবং অন্য নতুন বস্ত্র পরিধান করলে তার নতুন করে জন্মও হয় না। তাৎপর্য হল মৃত্যু এবং জন্ম শরীরের হয়, স্বয়ং-এর হয় না।

যে অনেক যোনিতে অনেক সুখ-দুঃখ ভোগ করে সেই স্বয়ং কারো সঙ্গে লিপ্ত হয় না, কোথাও জড়িয়ে পড়ে না। সে যদি লিপ্ত হয়ে যায়,

জড়িয়ে পড়ে তাহলে চুরাশি লক্ষ যোনি কে ভোগ করবে ? এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সকলেরই হয়েছে যে ; জাগ্রত অবস্থায় আমরা সব সময় থাকি না, সব সময় স্বপ্নের মধ্যে থাকি না, সুষুপ্তিতেও সব সময় থাকি না, মূর্ছাতেও সব সময় থাকি না এবং সব সময় সমাধি অবস্থাতেও থাকি না। তাৎপর্য হল স্বয়ং এই অবস্থা থেকে ভিন্ন, স্বয়ং এইসব অবস্থার জ্ঞাতা। যে সকল অবস্থা, সমস্ত পরিস্থিতি, সব কাজকর্ম এবং সকল পদার্থের সংযোগ-বিয়োগের জ্ঞাতা সেই স্বয়ং একই থাকে। স্বয়ং যদি একটি অবস্থায় লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে সে অন্য অবস্থাকে কীকরে জানবে, নিজের সেই অবস্থা থেকে ভিন্নতার অভিজ্ঞতা তার কী করে হবে ? কিন্তু সে অন্য অবস্থায় যায় এবং তা থেকে নিজেকে পৃথক অনুভব করে। অতএব আমি এইসব অবস্থা থেকে, পরিস্থিতি থেকে, ক্রিয়া থেকে, পদার্থ থেকে পৃথক—নিজের এই অভিজ্ঞতাকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। একে গুরুত্ব দিতে হবে, একে স্বীকার করতে হবে। একে শিখতে হবে না, শিখলে লাভ হবে না, বরং অহংকার হবে। এই অবস্থাগুলি থেকে নিজেকে পৃথক অনুভব করার নামই হল 'জ্ঞান' এবং ওইগুলির সঙ্গে মিশে যাওয়ার নাম হল 'অজ্ঞান'।

স্বয়ং-এর মধ্যে কর্তৃত্ব এবং লিপ্ততা নেই। এটি অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য যে মানুষ কখনো একটি কাজ করে, আবার কখনো অন্য কাজ ; কখনো একটি বিষয়ে লিপ্ত হয় তো কখনো অন্য একটি বিষয়ে। কর্তৃত্ব এবং লিপ্ততা কোনো কিছুর সঙ্গে বরাবরের জন্য থাকে না, তা পরিবর্তিত হতে থাকে। মানুষ যাই করুক তার অবসান হয়। মানুষ যাতেই লিপ্ত হোক না কেন তার বিয়োগ (উপরতি) হবেই। যেমন, আহারে প্রথম দিকে খুবই লিপ্ততা, রুচি থাকে। কিন্তু যেমন যেমন আহার করা হয় তেমনভাবেই তাতে অরুচি এসে যায়। এইভাবেই কর্তৃত্ব এবং লিপ্ততা নিরন্তর থাকে না, কিন্তু স্বয়ং চিরকাল থাকে। স্বয়ং-এ অকর্তৃত্ব এবং নির্লিপ্ততা স্বতঃসিদ্ধ। মানুষ যখন নিজেকে কোনো কিছুর কর্তা মনে করে তখনও সে স্বরূপত অসঙ্গই থাকে । যখন লিপ্ত থাকে তখনও স্বয়ং অসঙ্গই থাকে। যখন লিপ্ত থাকে না তখনও স্বয়ং অসঙ্গই থাকে। আমরা কখনো বসি, কখনো ঘুমাই, কখনো কোথাও যাই,

কখনো কারো সঙ্গে মিলিত হই—এই ক্রিয়াগুলি সবই আলাদা আলাদা, কিন্তু আমরা সেই একই থাকি। অতএব স্বয়ং সেই একই থাকে—এই কথাটি একেবারে নিজেদের বিবেকের দ্বারা সিদ্ধ। এতে ক্রিয়ার কী প্রয়োজন ?

তাৎপর্য হল এই যে, তত্ত্ব স্বতঃস্বাভাবিক। তার প্রাপ্তিতে কোনো ক্রিয়া, কোনো পরিশ্রম নেই ; তা সমগ্র দেশ, কাল, ক্রিয়া, বস্তু, ব্যক্তি, অবস্থা, ঘটনা, পরিস্থিতি প্রভৃতিতে 'অস্তি' (সত্তা) রূপে বিদ্যমান। দেশ, কাল প্রভৃতি তো নেই, কিন্তু তত্ত্ব আছে। দেশ, কাল প্রভৃতি তো বিকারযুক্ত, কিন্তু তত্ত্ব নির্বিকাররূপে যেমনকার তেমন থাকে। সাধক যখন নিজেকে নিজে হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ তার মধ্যে আমিত্ব ভাব, পরিচ্ছিন্নতা, ব্যক্তিত্ব থাকে না তখন সেই তত্ত্ব থেকে যায় অর্থাৎ অভিজ্ঞতায় এসে যায়।

তত্ত্ব অনাদি-অনন্ত এবং স্বতঃসিদ্ধ। তত্ত্ব যেমন আছে তেমনভাবেই তাকে জানতে হবে এবং তাকে জানার পর সে যেমন ছিল তেমনই থাকে। তাৎপর্য হল, জ্ঞান (বোধ) হওয়ার পর এমন অনুভূতি হয় না যে আমি এতদিন অজ্ঞানী ছিলাম, এখন জ্ঞানী হয়েছি অথবা আমার অজ্ঞানতা দূর হয়েছে আমি জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছি।

সংসারের নিবৃত্তি এবং পরমাত্মার প্রাপ্তি স্বতই হয়। নিত্য নিবৃত্তিরই নিবৃত্তি হয় এবং নিত্য প্রাপ্তিরই প্রাপ্তি হয়। বাস্তবে নিবৃত্তিও নেই, প্রাপ্তিও নেই। এইজন্য তত্ত্বজ্ঞান হয়ে গেলে নিবৃত্তি হয় না, প্রাপ্তিও হয় না বরং নিবৃত্তি প্রাপ্তির দৃষ্টি (মান্যতা) দূর হয় এবং তত্ত্ব যেমনকার থেকে যায়।[১] এই প্রকার বাস্তবে জ্ঞানও নেই, অজ্ঞানও নেই। আজ পর্যন্ত কেউ কখনো জ্ঞানী হননি, জ্ঞানী কেউ নেই, কেউ হবে না, হতে পারে না। তার কারণ জ্ঞানে ব্যক্তিত্ব নেই। অতএব জ্ঞান এবং জ্ঞানী, অজ্ঞান এবং অজ্ঞানী এই দুটি অজ্ঞানীর দৃষ্টিতেই আছে। এইজন্য সাধক হলেন স্ব-স্বীকৃত এবং সিদ্ধপুরুষ স্বতঃসিদ্ধ।

---

[১]খোয়া কহে সো বাবরা, পায়া কহে সো কূর।
পায়া খোয়া কুছ নহীঁ, জ্যোঁ-কা-ত্যোঁ ভরপূর॥

প্রশ্ন—পরমাত্মতত্ত্ব যখন এতই সুগম যে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া মাত্র তার প্রাপ্তি হয়ে যায়, তাহলে এতে বাধা কী ?

উত্তর—যে রীতিতে সাংসারিক বস্তু পাওয়া যায় সেই রীতিতে পরমাত্মারও প্রাপ্তি হয়—এটা মেনে নেওয়াই পরমাত্মপ্রাপ্তির পথে বড় বাধা। সাংসারিক বস্তুর প্রাপ্তি তো কর্মের দ্বারা হয় কিন্তু পরমাত্মার প্রাপ্তি কর্মের দ্বারা হয় না, তা হয় ভাব এবং বোধের দ্বারা। তার কারণ সাংসারিক বস্তুগুলিকে তৈরি করতে হয়, উৎপন্ন করতে হয়, কোথাও থেকে নিয়ে আসতে হয়, তার জন্য কোথাও যেতে হয়। কিন্তু পরমাত্মাকে তৈরি করতে হয় না, উৎপন্ন করতে হয় না, কোথাও থেকে আনতে হয় না, তার জন্য কোথাও যেতে হয় না। পরমাত্মা সমগ্র দেশ, কাল, বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, ঘটনা অবস্থা প্রভৃতিতে যেমনকার তেমন বিদ্যমান থাকেন। তাঁর প্রাপ্তির জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা নেই, এই জন্যই তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। আকাঙ্ক্ষা না হওয়ার কারণ শরীরের সঙ্গে একত্ব মেনে নিয়ে সুখভোগ করা। যেমন জালে আটকে পড়া মাছ এগোতে পারে না তেমনই সাংসারিক সুখে জড়িয়ে পড়া মানুষের দৃষ্টি পরমাত্মার দিকে এগোতেই পারে না। কেবল এইটুকু নয়, সাংসারিক সুখ (ভোগ এবং সংগ্রহ)-এ আসক্ত মানুষ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার সিদ্ধান্তও নিতে পারে না।[১]

সুখভোগ হল নিজের বিবেককে অনাদর করা। যদি মানুষ নিজের বিবেককে গুরুত্ব দেয় তাহলে সে সুখ ভোগ করতে পারে না। কারণ ভোগ্য বস্তুকে স্থায়ী মনে করেই সুখভোগ হয়ে থাকে। তাকে স্থায়ী মনে না করলে সুখভোগ হতেই পারে না। শরীর-সংসার প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে, মুহূর্তের জন্যও স্থির থাকে না—এই বোধ হলে মানুষ সুখভোগ করতেই পারে না।

---

[১]ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধিয়তে॥ (গীতা ২।৪৪)

'সেই পুষ্পিত (ভোগ এবং ঐশ্বর্যের প্রাপ্তির বর্ণনকারী) বাণীর দ্বারা যাদের অন্তঃকরণ ভোগের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে এবং যারা ভোগ এবং ঐশ্বর্যে অত্যন্ত আসক্ত, সেই মানুষদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হয় না।'

কারণ বিবেক জাগ্রত হলে মানুষের স্থিতি শরীরে থাকে না, তা থাকে স্বরূপে। তাই মানুষের উচিত বিবেককে গুরুত্ব দেওয়া। বিবেককে মানুষ যদি গুরুত্ব না দেয় তবে কি গাছ গুরুত্ব দেবে ? জন্তুরা গুরুত্ব দেবে ? তাহলে মানুষের সঙ্গে জন্তুর প্রভেদ কোথায় হল ?

সংসারে কোনো বস্তুই স্থির নয়। প্রত্যেক বস্তু প্রতি মুহূর্তে বিনাশের দিকে যাচ্ছে। এই কথাটি শিখতে হবে না, বুঝতে হবে, অনুভব করতে হবে। অনুভব করলে সুখাসক্তি থাকবে না।

কর্মযোগ

সমতাপূর্বক কর্তব্যকর্মের আচরণ করাকেই কর্মযোগ বলা হয়। কর্মযোগে মূলত নিষ্কামভাবেরই প্রাধান্য আছে। নিষ্কামভাব না থাকলে কর্ম কেবল 'কর্ম' হয়, কর্মযোগ হয় না। শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্ম করলেও তাতে যদি নিষ্কামভাব না থাকে তবে তাকে কর্মই বলা হয়। এমন ক্রিয়ায় মুক্তি সম্ভব নয়। কেননা মুক্তিতে ভাবেরই প্রাধান্য থাকে। নিষ্কামভাব সিদ্ধ হতে রাগ-দ্বেষই বাধা **'তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ'** (গীতা ৩।৩৪), এদুটি আধ্যাত্ম মার্গের লুণ্ঠক। এইজন্য রাগ-দ্বেষের বশীভূত হওয়া উচিত নয়। তাহলে কী করা উচিত ?

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহ॥

(গীতা ৩।৩৫)

—এই শ্লোকে গুণ বিশিষ্ট কথা বলা হয়েছে। এই একটি শ্লোকে চারটি চরণ রয়েছে। ভগবান খুব সুন্দর করেই এই শ্লোকটি রচনা করেছেন। এতে অল্প কথায় খুব গভীর অর্থ নিহিত রয়েছে। কর্মের বিষয়ে বলেছেন—

'শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ'

এখানে **'শ্রেয়ান্'** কেন বলা হয়েছে ? তা এজন্য যে অর্জুন দ্বিতীয় অধ্যায়ে গুরুজনদের হত্যা অপেক্ষা ভিক্ষা করাও 'শ্রেয়' বলেছিলেন— **'শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে'** (২।৫), কিন্তু **'যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে'** (২।৭)—এই শ্লোকে নিজের কোন্‌টি নিশ্চিত শ্রেয়, তা জানতে চেয়েছিলেন এবং তৃতীয় অধ্যায়েও আবার নিশ্চিত 'শ্রেয়' জানতে চেয়েছিলেন—**'তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন**

শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্' (৩।২)—এখানেও 'নিশ্চিত' কথাটি বলেছিলেন আর দ্বিতীয় অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকেও '**নিশ্চিতম্**' বলেছিলেন। ভাব হল এই যে আমার জন্য অমোঘ উপায় নির্দিষ্ট করুন। সেখানে অর্জুন প্রশ্ন করতে গিয়ে বলেছিলেন—'**জ্যায়সী চেৎ কর্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দন**' (৩।১), এখানে '**জ্যায়সী**' পদটি রয়েছে। এই জ্যায়সীকে ভগবান '**কর্মজ্যায়ো হ্যকর্মণঃ**' (৩।৮) শ্লোকে '**জ্যায়ঃ**' বলে উত্তর দিয়েছেন যে কর্ম না করার চেয়ে কর্ম করা শ্রেষ্ঠ। এখানে ভগবান ভিক্ষা করাকে নাকচ করে দিয়েছেন। তাহলে কোন্ কর্ম করা হবে ? এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যা স্বধর্ম সেইটিই কর্তব্য, তাকে আচরণ করো। অর্জুনের কাছে স্বধর্ম কোন্‌টি ? যুদ্ধ করা। অষ্টাদশ অধ্যায়ের তেতাল্লিশতম শ্লোকে ভগবান যাকে ক্ষত্রিয়দের স্বাভাবিক কর্ম বলেছেন, ক্ষত্রিয় হওয়ায় অর্জুনের কাছে সেইটিই কর্তব্যকর্ম। সেখানেও ভগবান '**শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ**' (১৮।৪৭) বলেছেন। স্বধর্মের নাম স্বকর্ম। এখানে স্বকর্ম হল যুদ্ধ করা। '**স্বধর্ম**'-এর সঙ্গে '**বিগুণঃ**' বিশেষণ কেন দিয়েছেন ? অর্জুন তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে যুদ্ধরূপী কর্মকে 'ঘোরকর্ম' বলেছেন ? এইজন্যই ভগবান তার উত্তরে তাকে '**বিগুণঃ**' বলে এইটিই জানিয়েছেন যে স্বধর্ম বিগুণ হলেও তা কর্তব্যকর্ম হওয়ায় শ্রেষ্ঠ। অতএব অর্জুনের পক্ষে যুদ্ধ করাই কর্তব্য, আবার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বত্রিশতম শ্লোকেও ভগবান জানিয়েছেন যে ক্ষত্রিয়দের কাছে ধর্মযুদ্ধের চেয়ে ভালো দ্বিতীয় কোনো সাধন নেই।

'পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ'

এর অর্থ হল, পরধর্মে গুণাবলীর বাহুল্য থাকলেও এবং তার আচরণ ভালোভাবে করা গেলেও এবং নিজের ধর্মে গুণাবলীর ন্যূনতা থাকলেও এবং তার আচরণ ভালোভাবে করা না গেলেও পরধর্ম অপেক্ষা স্বধর্মই '**শ্রেয়ান্**' অতি শ্রেষ্ঠ। যেমন স্বামীর মধ্যে গুণাবলির ন্যূনতা হলেও পতিব্রতা স্ত্রীর কাছে সেই-ই সেব্য। শ্রীরামচরিতমানসে বলা হয়েছে—

'বৃদ্ধ রোগবস জড় ধনহীনা। অন্ধ বধির ক্রোধী অতি দীনা।।'

—এই আটটি অবগুণ যদি নিজের স্বামীতে বিদ্যমান থাকে এবং তার সেবা-যত্নও যদি যথাযথভাবে করা সম্ভব না হয় আর অন্য দিকে অন্যের স্বামী যদি গুণবান হয় এবং তার সেবা-যত্নও ভালো হয় তবু স্ত্রীর কাছে নিজের স্বামীর সেবাই শ্রেষ্ঠ, সেই সেব্য ; পরের স্বামী কোনো অবস্থাতেই সেব্য নয়। সেইভাবেই স্বধর্মই **'শ্রেয়ান্'** (শ্রেষ্ঠ) ; পরধর্ম কখনো নয়।

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্মো ভয়াবহঃ ॥

(গীতা ৩।৩৫)

—এর দ্বারা ভগবান এই কথাই জানিয়েছেন যে কষ্টের শেষ সীমা হল মৃত্যু আর স্বধর্ম পালনে যদি মৃত্যুও হয়ে যায় তাহলেও তা পরিণামে কল্যাণকারী। তাৎপর্য হল, পরধর্মে যেসব গুণ, তার অনুষ্ঠানে সুগমতা এবং তা থেকে প্রাপ্তব্য যে সুখ প্রতীত হয় সেগুলির কোনো মূল্য নেই, অনুষ্ঠানে দুর্গমতা এবং কষ্টও খুবই মূল্যবান, কেননা তা পরিণামে কল্যাণকারী। আর স্বধর্মে যদি গুণের ন্যূনতা না থাকে, অনুষ্ঠান ভালোভাবে করা যায় এবং তাতে সুখও হয়, তাহলে তা যে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ—এতে বলার কী আছে!

উপরোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যানুসারে মানুষের উচিত কর্তব্যকর্মের নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করে যাওয়া।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

গীতায় শ্লোকগুলি থেকে এই কথাটিই সিদ্ধ হয় যে সকল কর্মের নামই হল যজ্ঞ। কী করে তা সিদ্ধ হয় এই বিষয়ে বিচার করা হচ্ছে। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোক থেকে বত্রিশতম শ্লোক পর্যন্ত যজ্ঞের বিশেষ বর্ণনা আছে। এর প্রকরণ আরম্ভ হয় চতুর্থ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোক থেকে। সেখানে ভগবান বলেছেন—

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥

এতে বলা হয়েছে যে যজ্ঞের নিমিত্ত আচরিত সমস্ত কর্ম সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে যায়। অর্থাৎ তা শুভাশুভ ফলের উৎপাদন করে না, ফলদায়ক বন্ধনকারক হয় না, জন্মদাতা হয় না। কর্মের লুপ্ততার এইটিই হল অর্থ।

এই কথাই ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ের নবম শ্লোকে অন্যভাবে বলেছেন—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।

যজ্ঞার্থ কর্ম ছাড়া অন্য কর্মে নিযুক্ত হলে এই সমুদয় মানুষ কর্মের বন্ধনে বন্দি হয়ে যায়।

অর্থাৎ যজ্ঞের অতিরিক্ত অন্য যেসব কর্ম সবই বন্ধনকারী। কেবল যজ্ঞার্থ কর্মই বন্ধনকারক নয়। উপরোক্ত দুটি জায়গাতেই 'যজ্ঞ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকে ভগবান যজ্ঞের বর্ণনা এইভাবে করেছেন।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥

এই প্রকরণে চতুর্দশ যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে এবং প্রাণায়ামকেও যজ্ঞরূপে জানিয়েছেন—

অপানে যুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ॥ (৪।২৯)
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি। (৪।৩০)

উপরে 'যুহ্বতি' ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছে। পরে অন্য ক্রিয়াও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ওই অধ্যায়েরই আটাশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন—

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥

টাকা-পয়সা অথবা বস্তু সামগ্রী দিয়ে যত পুণ্য কর্ম করা হয় তাকে 'দ্রব্যযজ্ঞ' বলা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে যাতে ইন্দ্রিয়, মন, শরীরে সংযম করা হয় সেই তপস্যাকেও 'যজ্ঞ' বলা হয়ে থাকে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি—পাতঞ্জলি যোগের এই আটটি অঙ্গকে তথা হঠযোগ, লয়যোগ, মন্ত্রযোগ প্রভৃতি অন্য যেসব যোগ আছে সেগুলিকেও ভগবান 'যোগযজ্ঞ' বলেছেন। স্বাধ্যায় অর্থাৎ অধ্যয়ন, স্মৃতির পঠন এবং এইসবের মননকে ভগবান স্বাধ্যায়যজ্ঞ নাম দিয়েছেন। আর এইগুলির দ্বারা প্রাপ্ত উপলব্ধিকে, শুধু তাই নয় ; যে কোনো কথাকে গভীরভাবে অনুধাবন করাকে 'জ্ঞানযজ্ঞ' বলেছেন। ভগবান এই সবগুলিকে 'যজ্ঞ' নামে অভিহিত করেছেন। তিনি চতুর্থ অধ্যায়ের বত্রিশতম শ্লোকে এই যজ্ঞ প্রকরণের উপসংহার করেছেন—

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥

এই শ্লোকে যজ্ঞকে কর্মজনিত বলা হয়েছে। এর পূর্ববর্তী শ্লোকে ভগবান বলেছেন—

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।

—যে কথা ভগবান চতুর্থ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে

বলেছিলেন—

যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।

—তারই উপসংহার যেন তিনি চতুর্থ অধ্যায়ের একত্রিশতম শ্লোকে করেছেন—যিনি যজ্ঞাবশেষ অমৃতকে ভোজন করেন তিনি সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করেন[১]। এইভাবে তৃতীয় অধ্যায়ের তেরোতম শ্লোকে রয়েছে—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।

যজ্ঞাবশেষ ভোজনকারী সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। লক্ষ্য করুন সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া, সকল কর্মের লীন হয়ে যাওয়া এবং যজ্ঞের দ্বারা ব্রহ্ম লাভ—এই তিনটি একই কথা, সবগুলির তাৎপর্যও একই। তৃতীয় অধ্যায়ের নবম এবং তেরো ও চৌদ্দ অধ্যায়ের তেইশতম এবং একুশতম—এই চারটি শ্লোকে যজ্ঞের ফলের কথা বলা হয়েছে—পরমাত্মতত্ত্বলাভ, সকল পাপের নাশ এবং সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ। সুতরাং পরমাত্মাকে লাভ করবার যত উপায় আছে সেই সবগুলিই গীতায় 'যজ্ঞ' নামে অভিহিত হয়েছে—এই কথা উপরোক্ত আলোচনায় সিদ্ধ হয়। মধ্যখানে দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায়যজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ, প্রাণায়ামযজ্ঞ প্রভৃতি সকল যজ্ঞের চর্চা হয়েছে। দান, ধ্যান, হোম, তীর্থভ্রমণ, ব্রতপালন সব কিছুই 'যজ্ঞ' শব্দের মধ্যে সমাহিত—এটি মানতেই হবে।

চতুর্থ অধ্যায়ের বত্রিশতম শ্লোকে বেদের বাণীতে অনেক রকম যজ্ঞের বিস্তারপূর্বক বর্ণনা আছে—এই কথা বলে ভগবান দহরাদির উপাসনাকেও 'যজ্ঞ' শব্দের দ্বারা তাতে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। গীতায় এর বর্ণনা নেই, তবে উপনিষদে আছে। ভগবান অর্জুনকে বলেছেন—

'এই সব কিছুকেই তুমি কর্ম থেকে উৎপন্ন বলে জানবে—'**কর্মজান্ বিদ্ধি**' আর এইভাবে জানলে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে—'**এবং জ্ঞাত্বা**

---

[১] 'যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।'

বিমোক্ষ্যসে।'

চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন—

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্॥

এখানেও ভগবান কর্মের উপর জোর দিয়েছেন। উপরোক্ত শ্লোকে **'এবং জ্ঞাত্বা'** দ্বারা এই তত্ত্বকে জানার যে কথা বলা হয়েছে—তা যে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সেই প্রসঙ্গটি চতুর্থ অধ্যায়ের ১৩ নং শ্লোকে আছে। সেটি এই রকম—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।

এখানেও 'কর্ম' শব্দটি আছে। এই কর্মের তত্ত্বের প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার। সকল কর্মের নাম 'যজ্ঞ' এই কথাটি এবার বলা হচ্ছে। চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োদশ শ্লোকের অবতারণা হয়েছে সেই অধ্যায়ের নবম শ্লোকে। নবম শ্লোকে ভগবান বলেছেন—**'জন্ম কর্ম চ মে দিব্যম্'** —আমার জন্ম-কর্ম দিব্য। কেন সেই কর্ম দিব্য ? ত্রয়োদশ শ্লোক থেকে ভগবান তাঁর কর্মের দিব্যভাবের প্রকরণ শুরু করেছেন এবং চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোক থেকে জন্মের দিব্যভাবের কথা বলেছেন। সেখানে তিনি তাঁর জন্মের দিব্যভাবের সঙ্গে তাঁর জন্মের হেতুর কথাও বলেছেন এবং জানিয়েছেন যে 'আমার জন্ম-কর্ম দিব্য এই কথাটি যে জানে সেই মুক্ত হয়ে যায়।' চতুর্থ অধ্যায়ের ১৩ নং শ্লোকে ভগবান বলেছেন—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥

'আমি চাতুর্বর্ণ্য সৃষ্টি করেছি অতএব সেইটিই হল আমার কর্ম। আর আমি হলাম তার কর্তা। তবুও তুমি আমাকে (কর্তাকে) অকর্তা বলে জান।' এর পর তিনি বলেছেন—

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে॥

'কর্ম আমাকে বাঁধে না এবং কর্মফলে আমার কোনো স্পৃহা নেই—এইভাবে যে জানে কর্ম তাকে বাঁধে না।' এইভাবে ভগবান তাঁর কর্ম

জানিয়েছেন আর একথাও বলেছেন যে, তাঁর কর্মকে যে জানে তাকে কর্ম বাঁধে না। কেন সে আবদ্ধ হয় না ? তার দুটি কারণ বলা হয়েছে— **'তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধি অকর্তারম্'**—'ওই সব কর্মের কর্তা হলেও আমাকে অকর্তা জানবে।' এই কথার তাৎপর্য হল 'ভগবান কর্তৃত্বাভিমান থেকে মুক্ত।' সেইসঙ্গে **'ন মে কর্মফলে স্পৃহা'** বলে তিনি জানিয়েছেন যে, তাঁর মধ্যে কর্মফলের ইচ্ছা নেই। সিদ্ধান্ত হল, যে কর্মে কর্তৃত্বের অহংকার থাকে না এবং ফলেরও ইচ্ছা থাকে না সেই কর্ম বন্ধনকারী নয়। তাই ভগবান বলেছেন—**'ইতি মাং যোঽভিজানাতি'**—যে কেউ আমাকে এমনভাবে জেনে নেয়, **'কর্মভির্ন স বধ্যতে'**—'কর্মের দ্বারা সে আবদ্ধ হয় না।' আমার মতো যে কেউ কর্তৃত্ব অভিমান এবং ফলাসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে কর্ম করবে সেও আবদ্ধ হবে না, এইভাবে ভগবান তাঁর নিজের কর্মের দিব্যতা জানিয়েছেন। যে কর্ম বন্ধনের কারণ সেই কর্মই মুক্তিদায়ক হয়ে যায়। এইটিই হল কর্মের দিব্যতা। এইজন্য কর্মযোগের প্রসঙ্গে ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেছেন—**'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'**—'কর্মে যোগই কুশলতা।' 'যোগ' কার নাম ? **'সমত্বং যোগ উচ্চতে'**—'সমতাকেই যোগ বলা হয়।' এই সমতা কী করে পাওয়া যায় ? **'সঙ্গং ত্যক্ত্বা'** এবং **'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা'**—মানুষ আসক্তি ত্যাগ করলে এবং সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সম হয়ে গেলে সমতা এসে যায়। সমতার নামই হল যোগ এবং যোগই কর্মে কুশলতা। যে কর্ম বাঁধে সেই কর্মই মুক্তিদায়ক হয়ে ওঠে—এইটিই হল কর্মের কুশলতা। এইজন্য বলা হয়েছে—

ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে।
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ॥

কিছু লোক বলেন যে যতক্ষণ মুমুক্ষা সৃষ্টি না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কর্ম করে যেতে হবে আর মুমুক্ষা সৃষ্টি হয়ে গেলে মানুষের সন্ন্যাস গ্রহণ করে কর্ম ত্যাগ করা উচিত। এটি হল অদ্বৈত-বেদান্তের প্রক্রিয়া। কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন—

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।

'মুমুক্ষু পুরুষেরা এমন জেনে কর্ম করেছেন।' কর্ম করছেন, কর্ম ত্যাগ করেননি।

কুরু কর্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরম্ কৃতম্।

'এইজন্য তুমি কর্মই কর', '**কর্মৈব কুরু**।'

এইভাবে ভগবান এখানে কর্ম করার উপরেই জোর দিয়েছেন। আবার চতুর্থ অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে বলেছেন—

কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥

'কর্ম কী, অকর্ম কী—এই কথাটি নিয়ে বড় বড় পণ্ডিতরাও বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। এখন আমি তোমাকে সেই কর্মের কথা বলব যা জেনে তুমি অশুভ থেকে, বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।' এইভাবে ষোড়শ শ্লোক থেকে উপরোক্ত বিষয়ের উপক্রম করে ওই অধ্যায়েরই বত্রিশতম শ্লোকে উপসংহার করেছেন। ষোড়শ শ্লোকে উনি যা বলেছিলেন—'**যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ**' সেই কথাই চতুর্থ অধ্যায়ের বত্রিশতম শ্লোকে এই বলে উপসংহার করেছেন—'**এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে**।' 'যজ্ঞ' এই কর্মেরই অন্তর্গত। যত শুভ কর্ম আছে সেই সবেরই নাম হল 'যজ্ঞ' আর সেই কর্মের দ্বারাই ভগবানকে পূজা করার কথা বলা হয়েছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের ছেচল্লিশতম শ্লোকে '**স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ**।' পূজারই নাম যজ্ঞ। এইভাবে যত কর্ম আছে সেগুলি সবই যজ্ঞ। যজ্ঞ শব্দের মধ্যে যত কর্তব্যকর্ম আছে সেই সবই এসে গিয়েছে। এখন একটু মন দিয়ে চিন্তা করুন—'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ কী হওয়া উচিত ? গীতা অনুসারে যজ্ঞ প্রভৃতি যত শুভ কর্ম আছে সেই সবই 'যজ্ঞ' শব্দের অন্তঃপাতী। এই 'যজ্ঞ' শব্দেরই চতুর্থ বিভক্তির রূপ হল 'যজ্ঞায়'—যজ্ঞের জন্য। 'যজ্ঞায়'-এর যা অর্থ 'যজ্ঞার্থ'-এরও সেই অর্থ। তৃতীয় অধ্যায়ের নবম শ্লোকে আছে—'**যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ**।' যজ্ঞার্থ কর্ম ছাড়া অন্য সকল কর্ম বন্ধনকারী। 'যথার্থ' কর্মের অর্থ যজ্ঞের জন্য করা কর্ম। চতুর্থ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে বলা হয়েছে—'**যজ্ঞায়াচরতঃ**', যজ্ঞের জন্য কর্ম করার অর্থ হল—কর্মের

জন্য কর্ম করা অর্থাৎ কেবল লোকসংগ্রহের জন্য কর্তব্য করা। ফলের ইচ্ছা, আসক্তি, কামনা, কর্তৃত্বাভিমান প্রভৃতি যেন না থাকে। ভগবান লোকসংগ্রহের কথা বলেছেন তৃতীয় অধ্যায়ের বিশতম, একুশতম শ্লোক দুটিতে—**'লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্তুমর্হসি।'** এরপর বাইশতম শ্লোকে বলেছেন—

ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥

'আমার জন্য তিন-লোকে কোনো কর্তব্যকর্ম অবশিষ্ট নেই এবং এমন কোনো প্রাপ্তব্য বস্তু বাকি নেই যা আজ পর্যন্ত আমি পাইনি। তাহলেও আমি কর্মে প্রবৃত্ত হয়ে থাকি।' এর অর্থ হল এই যে কেবল কর্তব্য বুদ্ধির দ্বারা, লোকসংগ্রহের দৃষ্টিতে, লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করে যাওয়া উচিত। নিজের কোনো স্বার্থ থাকবে না, কোনো কর্তৃত্ব-অভিমান থাকবে না, মমতা, আসক্তি, বৈষম্য, কোনো প্রকারের ইচ্ছা, কোনো আগ্রহ এবং কোনোরকম সম্বন্ধ থাকবে না। নির্লিপ্ত হয়ে যে কর্ম করা হয় সেইসব কর্মই 'যজ্ঞ' হয়ে যায়। কর্ম যজ্ঞার্থে করা হবে—যজ্ঞের জন্যই, লোক-পরম্পরাকে সুরক্ষিত রাখাই যেন তার উদ্দেশ্য হয়, লোকেদের পতন যেন না হয়। এইভাবে যে কর্ম করা হবে তা হবে 'যজ্ঞার্থ কর্ম'। 'যজ্ঞ' শব্দের এইটিই হল তাৎপর্য।

'যজ্ঞ' শব্দের অর্থ কী হওয়া উচিত তা আর একটি দৃষ্টিতে দেখুন। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে যে 'যজ্ঞ' শব্দটি আছে, সেই যজ্ঞের বিষয়ে অর্জুন সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে একটি প্রশ্ন করেছেন—

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥

'শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে যারা যজন করে তাদের নিষ্ঠা কীরকম ?' যত যজ্ঞ আছে সবই শাস্ত্রবিধির দ্বারা সম্পন্ন হয়—**'কর্মজান্বিদ্ধি তান্ সর্বান্।'** এবং 'বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে'—'এই যজ্ঞ বেদবাণীতে বলা হয়েছে।' বেদবাণীতে বলা হয়েছে অর্থাৎ শাস্ত্রে তার

বিধান আছে। কিন্তু অর্জুনের প্রশ্নে শাস্ত্রবিধি ত্যাগপূর্বক যজনের কথা বলা হয়েছে। এইখানেই এই প্রশ্ন করা হয়েছে যে, শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে যারা যজন করে তাদের নিষ্ঠা কেমন ? শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করার ফল তো বিপরীতই হবে এবং যাগযজ্ঞের ফল তো ভালোই হবে। উভয়ের সম্মিলিত পরিণামস্বরূপ তাদের নিষ্ঠা কেমন হবে এই প্রশ্নই অর্জুনের মনে জেগেছিল। এর উত্তর ভগবান সপ্তদশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে দিয়েছেন। যদিও বলা যায় যে, সম্পূর্ণ সপ্তদশ অধ্যায়টি এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে তবুও যজ্ঞের বিষয়ে উত্তর বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছে চতুর্থ শ্লোকে—

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ।।

এতে এইটি প্রমাণিত হয়ে গেল যে তাঁর মধ্যে সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক তিন রকমের নিষ্ঠাই থাকে। পূজা করা হয় দেবতাদের। প্রশ্ন হল '**যজন্তে**'-র দ্বারা যাঁর পূজার কথা বলা হয়েছে সেই দেবতা কে এবং তাঁর যজন কী ? এর মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে উপরোক্ত শ্লোকে এই কথাই বলা হয়েছে যে, সাত্ত্বিকদের পূজনীয় হলেন সাত্ত্বিক দেবতা, রাজসিক পুরুষদের পূজনীয় হলেন যক্ষ-রাক্ষস এবং ভূত ও প্রেতরা পূজনীয় হল তামসিক ব্যক্তিদের । এঁদের মধ্যে সাত্ত্বিক আরাধক কী করেন এবং রাজসিক-তামসিক আরাধক কী করেন ?—এর উত্তর চতুর্দশ অধ্যায়ে বিস্তারপূর্বক দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের গতি ওই অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে বলা হয়েছে। এখানে বিস্তারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এখানে সপ্তম শ্লোক থেকে ভগবান এর প্রকরণ শুরু করেছেন। ভগবান বলেছেন খাদ্য তিন প্রকারের। কিন্তু সেই প্রকারগুলির উল্লেখ করেও তিনি একথা বলেননি যে 'সেই খাদ্য কোনগুলি'। বরং এই কথাই বলেছেন 'সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক লোকেদের কোন্ কোন্ খাদ্য প্রিয় লাগে।' এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে 'তিনি এমন কেন করেছেন ?' এর উত্তর হল অর্জুন শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করে যাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে যজন করেন তাঁদের

নিষ্ঠা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। তাতে ভগবান সপ্তদশ অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে বলেছেন—

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥

অন্তঃকরণ অনুসারে শ্রদ্ধা হয়। এই অবস্থায় শ্রদ্ধার দ্বারাই তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাবে। তাঁর যজন-ক্রিয়া এবং শ্রদ্ধার দ্বারা তাঁকে চেনা যাবে। শাস্ত্রবিধি তিনি তো ত্যাগ করেছেন। অতএব সেই কষ্টিপাথরে তাঁকে যাচাই করা যাবে না। উপরে বলা হয়েছে যে শ্রদ্ধা তিন প্রকারের হয় এবং যাঁর যেমন শ্রদ্ধা তিনি সেইরকমই হন—এই নীতিতে শ্রদ্ধাবান পুরুষও তিন রকমের হন। তাই তিন রকমের খাদ্য তাঁদের রুচিকর লাগবে। যারা কোনো প্রকারের পূজা, উপাসনা করে না তাদের নিষ্ঠার পরিচয় তাদের খাদ্য থেকে পাওয়া যাবে। পূজা যদি কেউ নাও করে, আহার তো সে করবেই। তার দ্বারাই তার নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যাবে। এইজন্যই ভগবান খাদ্যের কথা বলেছেন—**'আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।'** কিছু লোক বলেন যে সপ্তদশ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে তিন প্রকারের খাদ্যের বর্ণনা আছে, কিন্তু বাস্তবে এমন কিছু নেই। ভগবান খাদ্যের সঙ্গে 'প্রিয়' শব্দ ব্যবহার করেছেন। 'প্রিয়' শব্দ এই জন্যই দেওয়া হয়েছে যে লোকদের যেমন খাদ্য প্রিয় হয় তাদের প্রকৃতিও সেই রকম হবে এবং তাদের প্রকৃতি, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা যেমন হবে সেই রকম খাদ্যই তাদের প্রিয় হবে। খাদ্যের প্রিয়তার সঙ্গে খাদ্যের বর্ণনা তো স্বতই হয়ে গেল। সাত্ত্বিক পুরুষদের সাত্ত্বিক খাদ্য প্রিয় লাগে, রাজসিক পুরুষদের রাজস এবং তামসিক পুরুষদের তামস খাদ্য প্রিয় লাগে। অন্তঃকরণ খাদ্যের অনুরূপ হয়। সপ্তম শ্লোকের পূর্বার্ধে খাদ্যের কথা বলে উত্তরার্ধে যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানের তিনটি পার্থক্য জানিয়েছেন। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে খাদ্যের সঙ্গে ভগবান যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানের কথা কেন তুলেছেন ? খাদ্যের কথা তো উঠেছিল পরীক্ষার জন্য অর্থাৎ তাদের প্রকৃতি জানার জন্য। এর উত্তর হল, অর্জুন তাঁর মূল প্রশ্নে যাঁরা যজন-

পূজন করেন তাঁদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। যজনের মধ্যে দান এবং তপস্যাও এসে যায়। এইজন্য পরে সপ্তদশ অধ্যায়ের তেইশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন—

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা।।

পরমাত্মার নাম—ওঁ, তৎ এবং সৎ। যে পরমাত্মা ব্রাহ্মণ, বেদ, যজ্ঞ সৃষ্টি করেছেন এই তিনটি নাম সেই পরমাত্মার। ব্রাহ্মণরা যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন করেন, বেদ যজ্ঞের বিধি জানায় আর যজনের ক্রিয়ার নাম হল যজ্ঞ। পরমাত্মা এই তিনটি রচনা করেছেন। তাই সপ্তদশ অধ্যায়ের চব্বিশতম শ্লোকে ভগবান বলেছেন—

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তোঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্।।

অতএব 'হরি ওঁ' এইভাবে উচ্চারণ করেই যজ্ঞানুষ্ঠান আরম্ভ করা উচিত এবং এইভাবেই ব্রহ্মবাদী পুরুষরা করে এসেছেন। এরপর ভগবান বলেছেন—

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ।।
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎপ্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে।।

(গীতা ১৭।২৫-২৬)

ভগবানের নামের উল্লেখ এইখানে এইজন্যই করা হয়েছে যে যজ্ঞ-দান-তপস্যায় যদি কোনো অঙ্গ-বৈরাগ্য ঘটে অথবা কোনো ন্যূনতা থেকে যায় তাহলে ভগবানের নামোচ্চারণে সেগুলির পূর্তি হয়ে যাবে। কেননা যজ্ঞ এবং ব্রাহ্মণ পরমাত্মা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে এবং বেদও পরমাত্মা থেকেই উদ্ভূত ও পরমাত্মার দ্বারাই প্রকট হয়েছে। এদের মধ্যে যদি কোনো ন্যূনতা থাকে তাহলে এই সবের মূল পরমাত্মার নাম নিলেই সেগুলি পূর্ণ হয়ে যাবে। অষ্টাদশ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকেও এই তিনটি

শুভকর্মের উল্লেখ আছে—

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥

কোথাও কোথাও শুভকর্মের সংখ্যা চারও বলা হয়েছে। যেমন অষ্টম অধ্যায়ের আটাশতম শ্লোকে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, তপ এবং দান—এই চারটি নাম আছে। কোথাও কোথাও পাঁচটিরও উল্লেখ রয়েছে—একাদশ অধ্যায়ের আটচল্লিশতম শ্লোকে '**ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।**' বেদ, যজ্ঞ, দান, তপের অতিরিক্ত পঞ্চম ক্রিয়াও এসে গিয়েছে। নবম অধ্যায়ের সাতাশতম শ্লোকে যজ্ঞ, দান প্রভৃতির সঙ্গে ভোজনের উল্লেখ হয়েছে—'**যদশ্নাসি**' কথাটির দ্বারা। এইভাবে শুভকর্মের নাম ভগবান কোথাও ছটি, কোথাও পাঁচটি, কোথাও চারটি, কোথাও তিনটি এবং কোথাও কেবল এক যজ্ঞের নির্দেশ দিয়েছেন। এক যজ্ঞের উল্লেখের দ্বারা সকল শুভ কর্মের উল্লেখ হয়ে গিয়েছে। '**যৎকরোষি**'-এর অন্তর্গত চারটি বর্ণের জীবনোপযোগী কর্মও এসে গিয়েছে। এর বর্ণনা ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ের একচল্লিশতম শ্লোকে প্রারম্ভ করে বিয়াল্লিশতম শ্লোকে ব্রাহ্মণের কর্ম, তেতাল্লিশতম শ্লোকে ক্ষত্রিয়ের এবং চুয়াল্লিশতম শ্লোকে বৈশ্য ও শূদ্রের কর্মের কথা বলেছেন। তারপর পঁয়তাল্লিশতম শ্লোকে ওইসব কর্মের দ্বারা প্রাপ্তব্য সিদ্ধির উল্লেখ করেছেন—'**স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।**' যে সিদ্ধির কথা যজ্ঞের সম্পর্কে বলা হয়েছে তার কথা এখানে বর্ণোচিত কর্মের দ্বারা বলা হয়েছে—

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥

'**স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য**'-এ কর্মের দ্বারা পূজার কথা আছে। অতএব এইসব কর্ম যজ্ঞরূপই তো হল ?

মা যখন রান্না প্রস্তুত করবেন তখন তিনি যেন এই কথাই মনে করেন যে তিনি ভগবানের পূজা করছেন। তাহলে রন্ধন করা ভগবানের পূজা হয়ে যাবে, মনু রান্না করার ক্রিয়াকেও 'যজ্ঞ' বলেছেন। মনু বলেছেন যে

স্ত্রীলোকদের পতিদেবতার গৃহে যাওয়া তাদের গুরুকুলবাস। কেননা, পতিই তাদের একমাত্র গুরু—**'পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাম্।'**

এখানে রান্না করা তার কাছে 'অগ্নিহোত্র'। অগ্নিহোত্রই যজ্ঞ। এইভাবে বিদ্যার্থী তার অধ্যয়নকে যজ্ঞ মনে করতে পারে। নিষ্কামভাবে এবং শুদ্ধ রীতিতে করা সাংসারিক সকল কর্মই হল 'যজ্ঞ'। আয়ুর্বেদজ্ঞ যদি কেবল জনগণের কল্যাণের জন্য বৈদ্যের কাজ করেন তবে তাঁর কাছে সেই কাজই হবে যজ্ঞ। এইভাবে গীতা অনুসারে কর্তব্যমাত্রই হল যজ্ঞ। তা ভগবানের পূজা হয়ে যায়। অবশ্য সকল কর্ম তখনই ভগবানের পূজা হবে যখন আপনারা সেগুলিকে ভগবানের পূজার জন্যই করবেন। কিন্তু আপনাদের ভাবনা যদি সে রকম না হয় তাহলে **'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ'**—যে যেমন শ্রদ্ধাবান তার নিষ্ঠাও তেমনই হবে। আপনারা যদি টাকা-পয়সার জন্য ব্যবসা করেন তাহলে আপনারা টাকা-পয়সাই পাবেন, আপনাদের করা ব্যবসা যজ্ঞ হবে না। কেননা আপনাদের শ্রদ্ধা এবং ভাবনা সেরকম নয়। যেখানে আপনাদের ভাবনা সেইরকম হবে সেইখানেই আপনাদের কর্ম যজ্ঞ হয়ে যাবে।

এখন চিন্তা করুন যে যজ্ঞ কাকে বলে এবং দেবতা কে ? যিনি যজ্ঞের ফল দেন, যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী তিনিই দেবতা। এখন যজ্ঞের দ্বারা তাঁর পূজা করতে হলে আহুতির দ্বারাই পূজা হতে পারে, আবার কর্তব্যকর্মের দ্বারাও হতে পারে। সকলেই কর্তব্যকর্মের দ্বারা পূজা করতে পারে। মানুষেরা মধ্যলোক—মর্ত্যলোকের অধিবাসী। স্বর্গলোক, মর্ত্যলোক এবং পাতাললোক এই তিনটি লোকের সমষ্টির নাম ত্রিলোক। ত্রিলোকের মধ্যখানে থাকে মানুষ। ভগবান মানুষের নিবাস মধ্যখানে এইজন্যই করেছেন যে তাতে সে দেবতাদেরও তৃপ্তি দিতে পারবে আবার নরক এবং অধোলোকে যারা থাকে তাদেরও তৃপ্তি দিতে পারবে। সকলের তর্পণ করা হয়। দ্বিজেরা দেবতাদের তর্পণ করেন, ঋষিদের তর্পণ করেন, পিতৃপুরুষের তর্পণ করেন, ভূতপ্রাণিদের তর্পণ করেন এবং ভূত, প্রেত, পিশাচ প্রভৃতি যোনিতে যেসব বন্ধু-বান্ধবেরা গিয়েছে

তাদের তর্পণ করেন। যাদের বংশে কেউ নেই তাদেরও তর্পণ করেন। এই বিষয়ে তর্পণের বিধি দেখুন। যাকে কেউ জল দেবার নেই তারও তর্পণ করেন। সাপ, বিছা প্রভৃতি যেসব জন্তু অধোগতিতে গিয়েছে, যারা মধ্য গতি লাভ করেছে এবং যাঁরা উর্ধ্বগতি লাভ করেছেন সবাইকে এমনকী সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবানের তর্পণও তাঁরা করেন। সমুদ্রেরও তর্পণ করেন। সমুদ্রে কি জল কম আছে যে জল দিয়ে তার তৃপ্তি বিধান করতে হবে ? তাৎপর্য হল মধ্যস্থলে অবস্থিত মানুষ সমস্ত লোকের জীবদের তৃপ্তি দেয়। এইরকম সকলকে তৃপ্ত করবার অধিকার ভগবান মানুষকেই দিয়েছেন। সে কেবল ত্রিলোকের জীবদেরই নয়, ভগবানকেও তৃপ্তি দেয়। ভগবানেরও ক্ষুৎপিপাসা মেটাবার যদি কেউ থাকে তবে সে মানুষ। ভগবান নবম অধ্যায়ের চৌত্রিশতম শ্লোকে বলেছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।

'আমার প্রতি মন নিমগ্ন করো, আমাকে ভজনা করো, আমাকে পূজা করো, আমাকেই নমস্কার করো।' এখানে প্রশ্ন উত্থিত হয় যে 'ভগবানেরও ক্ষুধা পায় ?' 'হ্যাঁ।' 'তাঁর মধ্যেও কোনো ন্যূনতা আছে নাকি ?' 'হ্যাঁ'—মজার কথা। জীবেরা অধোগতিতে যাচ্ছে, এইটিই হল ভগবানের ন্যূনতা। সমগ্র সংসার সংযুক্ত হয়ে ভগবানের স্বরূপ। অতএব যারা অধোগতিতে যায় ভগবানের ততটা অঙ্গই তো অধোগতি প্রাপ্ত হয়। এইটিই ভগবানের ক্ষুধা। ভগবান বলেছেন—'তুমি যদি তোমার সব কিছু আমার উপর অর্পণ কর তাহলে তোমার কল্যাণ হবে এবং আমারও কাজ সিদ্ধ হবে।' এইভাবে প্রমাণিত হল যে মানুষ ভগবানকে তৃপ্তি প্রদান করতে পারে। জীবজন্তুর তৃপ্তি তো তারা করেই। ভগবান তো এমন কথাও বলেছেন যে 'ভক্ত যদি আমাকে বিক্রি করে তাহলে আমি বিক্রিত হয়ে যাব।' **'মৈ তো হূঁ ভগতনকো দাস, ভগত মেরে মুকুটমণি'**—এইরকম অবস্থায় বলুন ভক্ত ভগবানের ইষ্ট নয় কি ? ভগবান তো অর্জুনকে অষ্টাদশ অধ্যায়ের চৌষট্টিতম শ্লোকে বলেছেন **'ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্।'** 'তুমি আমার ইষ্ট....।' জীব

ভগবানকে ইষ্ট বলে মানে। ভগবান বলছেন 'তুমি হলে আমার ইষ্ট।' যে ভগবানের প্রতি নিজের মন সমর্পণ করে তাকে ভগবান নিজের ইষ্ট বলে মানেন, তার আজ্ঞা পালন করেন। রামাবতারে ভগবান বলেছেন— 'আমি সীতাকে ত্যাগ করতে পারি, সমুদ্রে লাফাতে পারি, আগুনে প্রবেশ করতে পারি, কিন্তু পিতার আদেশ ভঙ্গ করবার শক্তি আমার নেই।' এই মানুষ চাইলে ভগবানের মা-বাবা হয়ে যেতে পারে, ভগবানের দাস হয়ে যেতে পারে, ভগবানের ভাই-বন্ধু হতে পারে, ভগবানের স্ত্রী হতে পারে, ভগবানের সন্তান হতে পারে, ভগবানের শিষ্য বা গুরু হয়ে যেতে পারে। নিজেদের আত্মীয়স্বজন নিয়ে আমরা খুশি হই। এই মানুষই ভগবানের সব কিছু হতে পারে। ভগবান তাকে সেই রকমই করে দেবেন এবং তাকে সেই রকমই সম্মান প্রদর্শন করবেন। তিনি তার সুপুত্র হয়ে যাবেন। ভাই যদি হন তবে প্রকৃতই হবেন। সুপুত্র, সৎপতি, সৎমাতা—সব কিছুই ভগবান হয়ে যাবেন। যদি শিষ্য হন তো ভগবান শ্রেষ্ঠ শিষ্যই হবেন। রাম তো বশিষ্ঠের শিষ্যই ছিলেন। তিনি বিশ্বামিত্রের পা টিপতেন। তিনি যেখানে যা কিছু হন সেইরূপেই তিনি সবকিছু যথাযথভাবে পালন করেন। মানুষ ভগবানের সবকিছু হতে পারে। এত বড় অধিকার ভগবান মানুষকে দিয়েছেন।

এবার সেজন্য বলেছেন—'**যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।**' এর আগে অষ্টম শ্লোকে বলেছেন—'**নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যাকর্মণঃ।**' নিয়ত কর্ম করো, আর কর্ম না করা অপেক্ষা করা শ্রেষ্ঠ। '**অকর্মণঃ তে শরীরযাত্রাপি ন প্রসিদ্ধ্যেৎ।**' 'কিছু যদি না কর তাহলে তোমার জীবন নির্বাহও হবে না, জীবনযাত্রাও চলবে না। কর্ম করলেই জীবননির্বাহ হবে।' শাস্ত্রে এই সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে কর্মের ফলে জন্তুরা বন্ধনে আবদ্ধ হয়। '**কর্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে।**' এটি লক্ষ্য করার মতো কথা যে এখানে 'জন্তু' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। 'জন্তু' শব্দের তাৎপর্য হল এই যে, জন্তু (পশু)ই বন্ধনে আবদ্ধ হয়, মানুষ হয় না। মানুষ সকাম কর্মের ফলে, স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা বন্ধনে

আবদ্ধ হয়। এমন মানুষকে জন্তুই মনে করতে হবে। গীতাও বলেছেন—**'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।'** যারা স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে মোহগ্রস্ত হয়েছে তারা কি মানুষ ? তারা হল জন্তু—তাদের আকৃতি মানুষের মতো হলেও **'যদ্ যদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তৎ তৎ কামস্য চেষ্টিতম্।'** জানোয়ারদের সকল কাজ কামযুক্ত-স্বার্থচালিত হয়। কামনার দ্বারাই কর্ম বন্ধনকারক হয়ে যায়।

এইজন্য ভগবান বলেছেন—

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।

যে কর্ম পরমাত্মার প্রসন্নতার জন্য, লোকসংগ্রহের জন্য, সব লোকের উদ্ধারের জন্য, আসক্তি, স্বার্থ এবং কামনাকে ত্যাগ করে করা হয় তা বন্ধনে আবদ্ধ করে না, এইটিই হল 'যজ্ঞ'।

এর পরের শ্লোকে ভগবান বলেছেন—**'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।'** সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞের সঙ্গে প্রজাদের সৃষ্টি করেছিলেন। এখানে **'প্রজাঃ'** শব্দের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সবই হয়ে যায়। **'প্রজাঃ'** শব্দের সঙ্গে **'সহযজ্ঞাঃ'** বিশেষণটি দেখে আশঙ্কা হয় যে যজ্ঞে সকলের অধিকার তো নেই তাহলে ভগবান সকল প্রজাদের সঙ্গে এই বিশেষণ কেন প্রয়োগ করেছেন ? এর উত্তর হল, এখানে যজ্ঞের যে ব্যাপক অর্থ 'কর্তব্যকর্ম' তাকেই গ্রহণ করতে হবে। 'যজ্ঞ'-এর এই অর্থটিই বুঝে নিতে হবে। **'স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য'**-এর দ্বারা ভগবান পরে এই কথাই বলেছেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—সকলেই যেন নিজেদের কর্মের দ্বারা তাঁকে পূজা করেন। এই কর্তব্যকর্মরূপ যজ্ঞের সঙ্গে প্রজাদের সৃষ্টি করে ভগবান বলেছিলেন—এর দ্বারা তোমরা সকলের সংবর্ধনা করো আর এইটিই তোমাদের ইষ্ট কামনা পূর্ণ করবে—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥

কিন্তু এই সঙ্গে ভগবান একথাও বলেছেন—'ইষ্ট কামনার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক স্থাপন করো না। তুমি যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদের পূজা

করো।’ যেমন, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঁয়তাল্লিশতম শ্লোকে ভগবান অর্জুনকে '**নির্যোগক্ষেম আত্মবান্**' হতে বলেছেন এবং নবম অধ্যায়ের বাইশতম শ্লোকে বলেছেন '**যোগক্ষেমং বহাম্যহম্**'। 'তোমার যোগক্ষেমের ব্যবস্থা আমি করব। তুমি এর জন্য চিন্তা ত্যাগ করো না।' এইভাবে এখানেও তিনি বলেছেন—'দেবতাদের তুমি পূজা করো, কিন্তু দেবতাদের কাছে তুমি কিছু চেয়ো না। দেবতারা তোমার কাজ করে দেবেন, কিন্তু তুমি এটি তাঁদের কাছে চেয়ো না।' চাইলে সম্বন্ধ জুড়ে যায়। চাওয়া-যুক্ত কর্ম হয়ে যায় 'তুচ্ছ'। উদাহরণস্বরূপ, আমি গীতার চর্চা করেছি, আপনি দিয়েছেন ভিক্ষা, দুজনের কাজ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু গীতার চর্চা আমি করলাম এবং সেই সঙ্গে এই স্বার্থ জুড়ে দিলাম যে গীতার কথা শোনালে আমার খাদ্য জুটে যাবে তাহলে আমার এই কাজ তুচ্ছ হয়ে যাবে। কোনো ক্রিয়ার সঙ্গে স্বার্থ জুড়ে নিলে সেই ক্রিয়া তুচ্ছ হয়ে যায়, নিকৃষ্ট হয়ে যায়, বন্ধনকারক হয়ে যায়। কেউ প্রশ্ন করলেন 'পরম শ্রেয় কী ?' উত্তর হল—'নিজের কর্তব্য পালন করো, কিন্তু তা করো লোকহিতের জন্য। তার সঙ্গে নিজের স্বার্থ জুড়ে দিও না।'

সুধীবৃন্দ, কী আর বলব ! আপনারা সকলে কাজ তো করেনই। বাড়িতে মা, বোন, ভাই, সন্তান, ছোটবড় সবাই কাজ করেন। কিন্তু বড় ভুল যা হয় তা এই যে আসক্তি, কামনা এবং স্বার্থের সঙ্গে আমরা সম্বন্ধ জুড়ে নিই। কিন্তু তার দ্বারা লাভ কিছু হয় না। লৌকিক লাভই হয় না। তাহলে আর অলৌকিক লাভ কী হবে ? বাসনাসক্ত লোকদের মানুষ ভালো বলে না। তারা বলে 'অমুক লোকটি খুবই স্বার্থপর, পেটুক, খোশামুদে।' ওই রকম কিছু চাইলে আমরা কি বেশি দেব ? কমই দেব। স্বার্থপর লোককে কেউ বেশি দিতে চায় না। কোনো সাধু-ব্রাহ্মণকে যদি কিছু দেন তাহলে ত্যাগী বলেই তো তাকে দেবেন। ভোগী আসক্ত বলে তো দেবেন না। বাড়িতেও তো ভোগী আসক্ত লোকদের কাছ থেকে জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়। যে আসক্ত নয় তার কাছে জিনিস বিনা বাধায় আসবে। যে আসক্ত তার কাছে জিনিস আসতে তো বাধা থাকবেই এবং কল্যাণেও খুবই বাধা হবে। এর বিপরীত নিজের কর্তব্য মনে করে যদি

সেবা করেন তাহলে সেবা তো মূল্যবান হবেই জিনিসও সহজেই এসে যাবে। বিনা খাটুনিতে আরামে পেয়ে যাবেন। সম্মান-সৎকার-শ্রদ্ধা—সব বিনা পয়সায় পেয়ে যাবেন। কিন্তু চাইলেই ফেঁসে যাবেন। এইকথা গীতা গ্রন্থি খুলে জানিয়েছেন। তোমরা যা কিছু করো এই রীতিতেই করো। তৃতীয় অধ্যায়ের দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্লোকে ভগবান বলেছেন—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥
ইষ্টান্ ভোগান্‌হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়েভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥

এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা বৃদ্ধি লাভ করো। যজ্ঞের দ্বারা পূজিত দেবতা তোমাদের উন্নতি করবেন। নিজেদের কর্তব্য সমাপনের দ্বারা সমগ্র সৃষ্টিকে সুখ প্রদান করো। তাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকল প্রাণীর কল্যাণ হবে। স্বার্থ, মমতা, আসক্তি ত্যাগ করে এবং কর্তৃত্বাভিমান ছেড়ে দিয়ে কর্তব্য-কর্ম করলে সমগ্র সৃষ্টি শান্তি লাভ করে, তাদের উদ্ধার হয়, কল্যাণ হয়, মঙ্গল হয়। কামনা ত্যাগ করলে কতই না উপকার হয় ! যাঁরা কর্তব্য-কর্ম করেন তাঁরা তা করতে থাকুন, অকর্তব্য একেবারেই করবেন না। আর কর্তব্যকর্মে কামনা, আসক্তি যদি না থাকে তাহলে সমগ্র জগতের কল্যাণ হবে, সকলের মঙ্গল হবে—'**শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।**' যে অপরকে তার ভাগ না দিয়ে নিজে খায় সে চোর—'**স্তেন এব সঃ।**'

ভগবান বলেছেন—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥

'যজ্ঞাবিশিষ্ট যে খায় সে সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায় আর যে নিজের জন্য ভোজনাদি করে সেই পাপী পাপকেই ভক্ষণ করে, নির্ভেজাল পাপই খায়।' মানুষের মধ্যে স্বার্থবুদ্ধি যত বেশি হবে সে ততই বড় পাপী হবে। আর একটি কথা আছে। যে যজ্ঞ করা হয় তাতে হোমই

প্রধান—আহুতি দেওয়াই প্রধান।

অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্টতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥

অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সূর্যনারায়ণের কিরণকে পুষ্ট করে, সেই কিরণ পুষ্ট হয়ে জলকে আকর্ষণ করে আর সেই জল মেঘে পরিণত হয়ে বৃষ্টিদান করে। সেই বৃষ্টিতে জগৎ তৃপ্ত হয়। এর দ্বারাও এই কথাটি প্রকট হয়। শুভ কর্ম করলে দেবতারা সন্তুষ্ট হন। আপনারা যদি মা-বাবার আদেশ মান্য করে শুভ কর্ম করেন তাহলে তার দ্বারা মাতা-পিতা প্রসন্ন হবেন। তাঁদের প্রসন্নতার মূল্য কম নাকি ? তা খুবই মূল্যবান নিধি। এইভাবে আপনারা যদি নিজেরা শাস্ত্রের অনুশাসন পালন করেন তাহলে কি ঋষি মুনি দেবতা প্রসন্ন হবেন না ? এইটিই হল যজ্ঞের দ্বারা তাঁদের পূজা করা। তাঁদের পূজা কীভাবে করা হবে তাও ভগবান বলেছেন—

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্যন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্যন্যো যজ্ঞ কর্মসমুদ্ভবঃ॥

অন্ন থেকেই সকল প্রাণীর জন্ম হয়। জলধরের দ্বারা অর্থাৎ বর্ষার ফলে অন্ন উৎপন্ন আর বৃষ্টি হয় যজ্ঞের কারণে। যজ্ঞ কীসের দ্বারা হয় ? 'যজ্ঞঃ **কর্মসমুদ্ভবঃ**।' যজ্ঞ কর্মের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। কর্ম হয় বেদ থেকে। বেদ প্রকট হয় অক্ষর পরমাত্মা থেকে। এইজন্য ভগবান বলেছেন—

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরাঃ॥ (১৭।২৩)

সব কিছুর মূল পরমাত্মা, পরমাত্মা থেকে বেদ প্রকট হয়েছে। বেদ জানিয়েছে ক্রিয়ার বিধি। ক্রিয়ার দ্বারা ব্রাহ্মণরা অর্থাৎ প্রজারা কর্ম করেছেন। সেই কর্মের দ্বারা হয়েছে যজ্ঞ, যজ্ঞ থেকে হয়েছে বৃষ্টি। বৃষ্টি থেকে অন্ন উৎপন্ন হয়েছে, অন্ন থেকে হয়েছে প্রাণী এবং সেই প্রাণীদের মধ্য থেকে মানুষ যজ্ঞ করেছে। পশু-পক্ষী তো যজ্ঞ করতে পারে না। এই যে গাছ, ঘাস, পাহাড় এরা কি আর যজ্ঞ করতে পারে ? মানুষই করতে পারে। এইভাবেই সৃষ্টিচক্র চলছে। সেই পরমাত্মা সর্বগত ব্রহ্ম যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকেন। পরমাত্মার সর্বজ্ঞতার বিষয়ে ভগবান বলেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা। (গীতা ৯।৪)

'অব্যক্তরূপে আমি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আছি।'

এখানে সংশয় জাগে যে ভগবান যখন সর্বজ্ঞত তখন তাঁকে যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত কেন বলা হল ? তিনি কি অন্যত্র নিত্য প্রতিষ্ঠিত নন ? তিনি তো সব জায়গাতেই নিত্য অবস্থিত। তাহলে যজ্ঞের বৈশিষ্ট্য কী ? এর উত্তর হল, যজ্ঞে পরমাত্মা প্রাপ্ত হন। মাটিতে সর্বত্রই জল আছে, কিন্তু জল পাওয়া যায় কুয়োতে, সব জায়গায় জল পাওয়া যায় না। পাইপে সর্বত্রই জল ভরা থাকে, কিন্তু যেখানে কল লাগান হয়েছে কেবল সেখানেই জল পাওয়া যায়। সব জায়গায় জল নেই একথা কি আমরা বলতে পারি ? কিন্তু সর্বত্র তা পাওয়া যায় না। এইজন্যই সর্বগত ব্রহ্মকে যজ্ঞে নিত্য প্রতিষ্ঠিত বলা হয়েছে। যজ্ঞ কোন্ রকমের ? কর্তব্য-কর্মমাত্র—যা নিষ্কামভাবে করা হয় তাই 'যজ্ঞ'।

এবার দেখুন, যজ্ঞের পরিভাষা স্পষ্ট হয়ে গেল। সেই যজ্ঞে পরমাত্মাকে পাওয়া যায় এই কথাও বোধগম্য হল। সেই যজ্ঞের বিষয়ে ভগবান বলেছেন—

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ। (গীতা ৩।১৩)
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্। (গীতা ৪।৩১)
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ। (গীতা ৪।১৬)

এইজন্য যে পরমাত্মাকে লাভ করতে চাইবে সে যেন যজ্ঞ করে। যে যজ্ঞ করে না তার সম্পর্কে ভগবান বলেছেন—

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥(গীতা ৩।১৬)

উপরোক্ত চক্রকে যে অনুবর্তন করে না, সেই অনুসারে চলে না, তার জন্য ভগবান তিনটি বিশেষণ দিয়েছেন—

'অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি।' 'অঘায়ু' বলার তাৎপর্য হল তার আয়ু, তার জীবন নির্ভেজাল পাপময়। গোস্বামী তুলসীদাস বলা হয়েছে—

'জীবত জড় নর পরম অভাগী'—তারা খুবই অভাগা।

'জীবত সব সম চৌদহ প্রানী'—প্রাণ থাকতেও তারা মৃতের মতন যারা ভগবানের পথে চলে না। তাদের আয়ু পাপময়। বলা হয়েছে—

পর নিন্দা পর দ্রোহ রত পর ধন পর অপবাদ।
তে নর পাঁবর পাপময় দেহ ঘরে মনুজাদ॥

এইরকম লোকেরা নররূপে রাক্ষস। রাক্ষস মানুষদের খেয়ে ফেলে। তাদের জন্য দ্বিতীয় বিশেষণ দিয়েছেন—**'ইন্দ্রিয়ারাম'**। কেবল ইন্দ্রিয়-গুলিকে সুখ দেওয়া—ভোগে লিপ্ত থাকা, সুস্বাদু ভোজন করা, সুন্দর দৃশ্য দেখা, কোমল বস্তু স্পর্শ করা, আলস্যভরে নিদ্রা যাওয়া—এইগুলি হল ইন্দ্রিয়ারামতা। তৃতীয় কথা বলেছেন—**'মোঘং পার্থ স জীবতি'**—সে সংসারে মিথ্যাই বেঁচে থাকে। এটি হল সভ্যতার ভাষা। তাৎপর্য হল সে যদি মরে যায় তো ভালোই। তার বেঁচে না থাকাই ভালো। তুলসীদাস বলেছেন—**'কুম্ভকরন সম সোবত নীকে ?'** তারা ঘুমিয়ে থাকলেই ভালো। অভিপ্রায় হল এই রকম মানুষ পৃথিবীর কাছে ভারস্বরূপ। পৃথিবী বলেছে—'আমার উপর বনস্পতির ভার নেই, পাহাড়েরও ভার নেই। আমার উপর তাদেরই ভার রয়েছে যারা ভগবৎভক্তিতে হীন'—**'ভগবদ্ভক্তিহীনো যস্তস্য ভারঃ সদা মম।'** আমার উপর তার ভার সব সময় থাকে—'যে উপরোক্ত সৃষ্টিচক্রের অনুবর্তন করে না'। ভগবান বলেছেন, 'তার জীবন ভারস্বরূপ।' সৃষ্টিচক্রের অনুবর্তন কী—তা উপরে বলে দেওয়া হয়েছে। নিষ্কামভাবে অথবা ভগবানকে পূজা করার ভাবে নিজের কর্তব্য তৎপরতার সঙ্গে সম্পন্ন করাই হল সৃষ্টিচক্রের অনুবর্তন। যার যেখানে যে কর্তব্যকর্ম সে সেটি করবে। তাতে কর্তৃত্বাভিমান থাকবে না। মমতা থাকবে না, আসক্তি থাকবে না, কামনা, পক্ষপাত, বৈষম্য থাকবে না। এগুলি সবই বিষের মতো। সিঙ্গিমোরা, সংখিয়া, কুচিলা, ভিলারা প্রভৃতি যেসব বিষ আছে সেগুলিকে বৈদ্যেরা শুদ্ধ করে ওষুধ রূপে ব্যবহার করেন। তাতে ব্যাধির উপসম হয়। তাতে যদি বিষ থাকে তাহলে তাতে মানুষ মরে যায়। আসক্তি, কামনা, পক্ষপাত, বৈষম্য, অহংকার, স্বার্থ প্রভৃতি কর্ম বিষের মতো। এই বিষের অংশকে বার করে দিলে আমাদের কর্ম মহান অমৃতময় হয়ে গিয়ে জন্ম-মৃত্যুকে অপসরণকারী হয়ে যাবে। কত বড় কথা ! গীতা আমাদের এইটিই শেখায়।

কর্মযোগের তত্ত্ব

বাস্তবে কর্মযোগ কী এই কথা খুব কম লোকেই জানেন। তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ পাওয়া কঠিন, কিন্তু কর্মযোগের তত্ত্ব জানেন এমন মানুষ পাওয়া আরও কঠিন। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ভগবান বলেছিলেন যে, অনেক সময় গত হওয়ার কারণে সেই কর্মযোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে গিয়েছে—'**স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ**' (গীতা ৪।২)। এখন তা আরও বেশি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। গ্রন্থে কর্মযোগের আলোচনা নেই। পড়াশোনার মধ্যেও কর্মযোগের আলোচনা নেই। সৎসঙ্গের মধ্যেও কর্মযোগের আলোচনা পাওয়া যায় না। এর অধ্যয়ন লুপ্ত প্রায়। এইজন্য কর্মযোগের কথা খুবই কঠিন মনে হয়। কর্মযোগের আলোচনায় কয়েক ঘন্টা লেগে যেতে পারে। আমি তার কিছু সার কথা জানাচ্ছি।

সর্বপ্রথম কথাটি হল এই যে 'কর্মযোগই' বলুন আর 'নিষ্কাম কর্মই' বলুন দুটি একই জিনিস। 'নিষ্কাম কর্মযোগ' কথাটি ঠিক খাপ খায় না। এর কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু ভালো ভালো বুঝদার লোকও 'নিষ্কাম কর্মযোগ' বলে থাকেন। সেজন্য একথা বলতে সঙ্কোচ হয় যে 'নিষ্কাম কর্মযোগ' বলা সম্পূর্ণ ভুল। যদি 'নিষ্কাম কর্ম' বলেন বা 'কর্মযোগ' বলেন তো ঠিক আছে। কিন্তু 'নিষ্কাম কর্মযোগ' কেমন হবে ? কিন্তু কী করা যাবে ? কাকেই বা বলবো ?

আমার খুবই দুঃখ হয় যে ভাই বা বোনেদের মধ্যে কেউই এই তত্ত্বকে জানার জন্য উৎসুক নন, জানতে প্রস্তুত নন। তাঁরা জানবার জন্য আগ্রহ করেন না। আসলে এটা কী, অন্তত এইটুকু তো জানুন। মানবেন, কি মানবেন না সেটা আপনার ইচ্ছা। কিন্তু তত্ত্ব কী তা জানবার জন্য তো

অন্তরে ইচ্ছা জাগ্রত হোক ! আমার ধারণায় আপনারা এই তত্ত্বকে বোঝার অযোগ্য নন, অনধিকারী নন। আপনারা সকলেই এটি বুঝতে পারেন। কিন্তু বুঝতে না চাইলে কী করা যাবে ?

গীতায় দুটি জায়গায় যোগের পরিভাষা দেওয়া হয়েছে। সমতার নাম যোগ—**'সমত্বং যোগ উচ্চতে'** (২।৪৮)। আর দুঃখের সঙ্গে যে সংযোগ তা সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হওয়ায় নাম যোগ—**'তৎ বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসঞ্জিতম্'** (৬।২৩)। সম কী ? সম হল ব্রহ্ম—**'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম'** (৫।১৯)। দুঃখের একেবারেই অবিদ্যমানতা কখন হয় ? পরমানন্দকে লাভ করলে তা হয়। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ এবং হঠযোগ, রাজযোগ, মন্ত্রযোগ প্রভৃতি যোগ আছে। সেই সব যোগেরই তাৎপর্য হল পরমাত্মার সঙ্গে যে নিত্যযোগ অর্থাৎ নিত্যসম্বন্ধ, তার জাগৃতি। জীবের সঙ্গে পরমাত্মার নিত্য যোগ। কর্মযোগ তাকেই বলা হয় যাতে কর্ম হয়ে যায় সংসারের জন্য এবং যোগ হয়ে যায় পরমাত্মার সঙ্গে। এখন তাকে নিষ্কামভাবে কর্ম করাও বলতে পারেন আবার কর্মযোগও বলতে পারেন।

শ্রোতা—কর্মযোগের দ্বারা পরমাত্মার প্রাপ্তি কীভাবে হবে ?

স্বামীজী—এবার মন দিন। আপনার সংশয় হল আমরা কর্ম তো সংসারের কল্যাণের জন্য করি। তাহলে তার দ্বারা পরমাত্মাকে কী করে লাভ করা যাবে ? যেমন, কেদার-বদ্রীর দিকে গেলে দ্বারকায় পৌঁছবেন কী করে ? হতে থাকল এক দিকে আর প্রাপ্তি ঘটল অন্য দিকে—এমন কখনো হয় ? যাচ্ছেন উত্তর দিকে আর পৌঁছালেন দক্ষিণ দিকে অথবা যাচ্ছেন দক্ষিণ দিকে কিন্তু পৌঁছালেন উত্তরে, এ কেমন করে হবে ? এ সম্ভব নয় ? এইজন্যই শঙ্কা জাগে এবং তা ঠিক।

সর্বপ্রথম যে কথাটি বলছি, সেদিকে আপনারা মন দিন। পরমাত্মতত্ত্ব সর্বত্র আছে, না নেই ? এটিই হল মূল কথা ? এই বিষয়ে আমি চারটি কথা বলছি—১। পরমাত্মা সর্বত্র বিদ্যমান, ২। পরমাত্মা সব সময়েই বিদ্যমান, ৩। পরমাত্মা সব বস্তুতে বিদ্যমান এবং ৪। পরমাত্মা সকলের

জন্য বিদ্যমান। এমন নয় যে তিনি আমার খুব কাছে রয়েছেন আর আপনাদের থেকে দূরে রয়েছেন। পরমাত্মা সাধু-মহাত্মা, জীবন্মুক্ত, তত্ত্বজ্ঞ, ভগবৎপ্রেমী প্রভৃতির যত কাছে থাকেন ঠিক ততটাই কাছে থাকেন প্রচণ্ড পাপী এবং দুরাচারীরও। পরমাত্মা নিজে থেকে দূরে নেই। জীবই তাঁর থেকে বিমুখ হয়।

পরমাত্মা যখন সর্বত্র বিদ্যমান তাহলে তিনি কি এখানে নেই ? যদি তিনি এখানে না থাকেন তিনি সর্বত্র আছেন একথা বলা যাবে না। এখানে ছাড়া সর্বত্র আছেন, এমন কথা কি বলা যায় ? তাহলে সর্বত্র একথা বলা যায় না। তেমনই পরমাত্মা যখন সব সময় বিদ্যমান তাহলে এখন কি তিনি নেই ? যদি এখন না থাকেন তাহলে সব সময় থাকেন একথা বলার সাহস কারো হবে না। আবার পরমাত্মা যখন সকল বস্তুতে বিদ্যমান তাহলে আমাদের মধ্যে কি তিনি নেই ? শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং অহং (আমি আছি)—এইসবের মধ্যে পরমাত্মা আছেন। না নেই ? এগুলিতে যদি না থাকেন তাহলে পরমাত্মা সকল বস্তুতে বর্তমান, একথা বলা ঠিক নয়। আমি যেখানে রয়েছি পরমাত্মা সেখানে নেই, একথা বলা যায় না। আমার মধ্যে পরমাত্মা নেই একথা বলার সাহস কোনো আস্তিকের নেই। পরমাত্মা যখন সকলের তখন তিনি আমারও। তিনি যদি আমার না হন তাহলে তিনি সকলের একথা বলা যাবে না। সকল জীব তাঁরই অংশ—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭), **'ঈশ্বর অংস জীব অবিনাশী'**, (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১১৭।১)। ভগবান বলেছেন, আমি প্রাণীমাত্রেরই সুহৃদ—**'সুহৃদং সর্বভূতানাম্'** (গীতা ৫।২৯)। তিনি কোনো একজনেরও সুহৃদ নন এমন হতেই পারে না। যিনি সব জায়গাতেই আছেন, সব সময়ে আছেন, সকল বস্তুতে আছেন এবং যিনি সকলেরই—এমন পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে কী করবেন ? কোনো একটি যোগের অনুষ্ঠান করুন। এখানে প্রসঙ্গ কর্মযোগের, তাই কর্মযোগের কথা বলছি।

কর্মের দ্বারা পরমাত্মার যোগ (নিত্যসম্বন্ধ) কখন হবে ? যখন আমরা

নিজেদের জন্য কোনো কর্ম করব না। খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, জাগা-ঘুমানো, চিন্তন করা, ভজন-ধ্যান করা এবং সমাধিস্থ হওয়া—কোনোটাই নিজেদের জন্য একেবারেই করবেন না, তাহলেই কর্মযোগ হবে, নয়তো কর্মভোগ হবে। নিজের জন্য কর্ম করলে ভোগ হয়, যোগ হয় না। এইটিই মূল কথা।

নিজের জন্য কর্ম করতে হবে না—একথা শুনে লোকে ধন্ধে পড়ে যে নিজের জন্য না করলে কার জন্য করব ? একটা কথা বলছি, আপনাদের খারাপ লাগলে ক্ষমা করবেন। জপ নিজের জন্য নয়, তপ নিজের জন্য নয়, সমাধি নিজের জন্য নয়, প্রার্থনা নিজের জন্য নয়—এগুলিকে নিজের জন্য করতে হবে না। তার কারণ মূলত আমরা পরমাত্মার অংশ—

ঈস্বর অংস জীব অবিনাসী। চেতন অমল সহজ সুখ রাসী॥

(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড, ১১৭।২)

যে চেতন, মলরহিত এবং সুখরাশি, তার জন্য কী করতে হবে ? তার জন্য কিছুই করতে হবে না। আমরা নিজেদের জন্য করি এইটিই হল বন্ধন। এই কথাটি কিছু কঠিন, সকলে বুঝতে পারে না। কিন্তু নিজের জন্য করলে বন্ধন হবে। কী করে বন্ধন হবে ? কর্ম করলেই তার প্রারম্ভ হবে, শেষও হবে। তা থেকে যে ফল পাওয়া যাবে তার সংযোগও হবে, বিয়োগও হবে। আপনারা যখন নিত্য বিদ্যমান তখন সেই কর্ম আপনাদের উপযোগী হবে কী করে ?

খুব গভীরভাবে মন নিয়োগ করুন। নিজেদের জন্য কিছুই করতে হবে না। এটি বেদান্তের সিদ্ধান্ত, অদ্বৈতমার্গের সিদ্ধান্ত এবং ভক্তিমার্গেরিও সিদ্ধান্ত। যত দার্শনিক হয়েছেন সকলেরই এই মত। জীবাত্মা পরমাত্মার সাক্ষাৎ অংশ। কর্মের দ্বারা তার বৃদ্ধিও হয় না, হ্রাসও হয় না—**‘কর্মণা ন বর্দ্ধতে নো কনীয়ান্’**—তা যেমনকার তেমনই থাকে। আপনারা চান যে কর্মের দ্বারা তাঁকে পাবেন। এখানেই ভুল হয়। আমরা কর্ম করব এবং তা করব অন্যের জন্য। সংসারের বস্তু এবং সকল কর্ম অপরের জন্য,

কেননা বস্তু এবং ক্রিয়া—এই দুটিই প্রকৃতির, পরমাত্মার নয়। পরমাত্মা পদার্থ এবং ক্রিয়া থেকে অসংলগ্ন।

পরমাত্মা সকল বস্তুতে আছেন এবং সকল ক্রিয়াতে আছেন। সকলের মধ্যে থেকেও পরমাত্মা সকলের ঊর্দ্ধে, নির্লিপ্ত। পরমাত্মাতে লিপ্ততা নেই। আমরা কর্ম করি এবং ফল চাই—এইটিই হল গুণের সঙ্গ যার ফলে উচ্চ নিচ যোনিতে জন্ম নিতে হয় (গীতা ১৩।২১)। কর্মের ফল বিনাশশীল, অবিনাশী নয়। ফল তারই হয় যা আগে নেই বরং যার সৃষ্টি হয় এবং বিনাশ হয়। অতএব পরমাত্মতত্ত্ব কর্মফল হতে পারে না।

জ্ঞানের দ্বারা যে বোধ হয় তা ফল নয়। ভক্তিতে যে প্রেম হয় তা ফল নয়। কর্মযোগের দ্বারা যে যোগ হয় তা ফল নয়। যখনই ফল হবে তা বিনাশশীলই হবে। ফল কখনো অবিনাশী হতেই পারে না, কখনো সম্ভবই নয়। তাহলে কর্ম কীসের জন্য করা হবে ? সংসারের প্রতি যে অনুরাগ তাকে নিবৃত্ত করবার জন্যই কর্ম করতে হবে। কর্ম অনুরাগের পূর্তির জন্য করা যায় আবার নিবৃত্তির জন্যও করা যায়। কর্মের আরম্ভ কেবল অনুরাগের নিবৃত্তির জন্যই করা উচিত। জড়ের সঙ্গে আমরা যে সম্বন্ধ যুক্ত করেছি সেই সম্বন্ধের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাবার জন্যই কর্ম করতে হবে। সম্বন্ধ বিচ্ছেদ তখনই হতে পারে যখন কর্ম অপরের জন্য করা হবে। নিজের জন্য কর্ম করলে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হবে না।

স্থূল শরীরের দ্বারা অপরের সেবা করুন, স্থূল বস্তু দান করুন, কিন্তু তার ফল চাইবেন না। কারণ হল, আমাদের না আছে ক্রিয়া, না আছে বস্তু। তাহলে ক্রিয়া করা এবং দান-পুণ্য করা আমাদের জন্য কী করে হবে ? এইভাবে সূক্ষ্ম শরীরে এই কথা চিন্তা করতে হবে যে সকল প্রাণীর হিত কী করে করা যাবে ? সকলের কল্যাণ কী করে করা যাবে ? সকলের উপকার কী করে হবে ? কী করে সকলের সেবা হবে ? এখন থাকল কারণ শরীরের কথা ! কারণ শরীরকে অবিদ্যা বলা হয় এবং তাতে স্বভাবই মুখ্য থাকে। এর পরের কিছু আমরা জানি না। এর নাম কারণ

শরীর। স্থূল শরীরে জাগ্রত অবস্থা, সূক্ষ্ম শরীরে স্বপ্ন অবস্থা এবং কারণ শরীরে সুসুপ্তি অবস্থা (গাঢ় নিদ্রা) হয়। এই তিনটি অবস্থা প্রকৃতির সঙ্গ থেকে হয়। সমাধি হয় কারণ-শরীরে। সমাধিতে কোনো স্ফূরণ বৃত্তি হয় না, সম্পূর্ণ স্থিরতা থাকে। এই সমাধিও আমাদের নিজেদের জন্য নয়। তখনই হবে কর্মযোগ। তার কারণ, সমাধিও কর্ম। যেমন **'গচ্ছতি'** ক্রিয়া, **'চিন্তয়তি'** ক্রিয়া, **'ধ্যায়তে'** ক্রিয়া তেমনই **'সমাধীয়তে'**ও ক্রিয়া। করাও ক্রিয়া এবং না-করাও ক্রিয়া। ভগবান বলেছেন—**'নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।'** (গীতা ৩।১৮) অর্থাৎ কর্মযোগের দ্বারা সিদ্ধ মহাপুরুষের এই সংসারে কর্ম করার প্রয়োজন থাকে না, কর্ম না-করারও প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং আমাদের কাছে করাও নেই, না করাও নেই।

শরীর এবং বস্তুর দ্বারা অপরের হিতসাধন করলে শরীর এবং বুদ্ধি শুদ্ধ হয়। অনুরূপভাবে অপরের হিত চিন্তা করলে মন-বুদ্ধির শুদ্ধি হয়। ভগবান বলেছেন যে যিনি প্রাণীমাত্রের হিতে রত থাকেন তিনি আমাকে লাভ করেন—

তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ। (গীতা ১২।৪)

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতেহিতে রতাঃ।। (গীতা ২।২৫)

সগুণ ও নির্গুণ—উভয়ের প্রাপ্তির জন্য **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** পদটি এসেছে। অপরের হিতের জন্য আপনাকে এতটা করতে হবে—এমন কোনো কথা নেই। আপনার প্রেম, রুচি, প্রীতি যেন অপরের হিতের জন্য হয়।

পরহিত বস জিন্হ মে মন মাহীঁ। তিন্হ কহুঁ জগ দুর্লভ কছু নাহীঁ।।

(শ্রীরামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড ৩১।৯)

যার অন্তরে অপরের হিতসাধনের ভাব থাকে তার আর কিছুই করার বাকি থাকে না।

গীধ অধম খগ আমিষ ভোগী। গতি দীন্হীঁ জো যাজত যোগী॥

(শ্রীরামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড ৩৩।২)

যোগী যে গতির জন্য যাঞ্চা করেন ভগবান সেই গতি শকুনকে দিয়ে দিয়েছেন। সে (শকুনরাজ জটায়ু) চতুর্ভুজরূপ ধারণ করে হরিরূপে বৈকুণ্ঠে গিয়েছিল। তার জন্য ভগবান বলেছিলেন—**'তাত কর্ম নিজ তেঁ গতি পাঈ'** (শ্রীরামচরিতমানস, অরণ্যকাণ্ড ৩১।৮) অর্থাৎ এতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। তুমি নিজের কর্মের দ্বারা এই গতি প্রাপ্ত হয়েছ। কী কর্ম ? সীতাকে রক্ষা করবার জন্য রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। সীতা যখন নিজেকে বাঁচাবার জন্য চিৎকার করছিলেন তখন সে দেখেছিল যে, আরে এ যে রঘুকুলতিলক রামের স্ত্রী, একে এক দুষ্ট নিয়ে যাচ্ছে। সে সান্তনা দিয়েছিল—মা ! তুমি চিন্তা করো না, আমি এখনই যাচ্ছি। জগজ্জননী সীতাকে সে মেয়ে বলে ডাকছে ! তার কারণ সে দশরথের বন্ধু ছিল। দশরথের পুত্রবধূ আমার পুত্রবধূ হল, আমার মেয়ে হল—এই ভাব নিয়ে সে সীতাকে মেয়ে (মা) বলে সম্বোধন করেছিল। রাবণের সঙ্গে সে এমন যুদ্ধ করেছিল যে রাবণ মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধ করতে করতে রাবণ যখন তলোয়ার দ্বারা তার ডানা কেটে দেয় তখন সে নীচে পড়ে যায়। কেননা পাখির কাছে ডানাই হল তার শক্তি। এইভাবে সে অন্যের হিতের জন্য নিজেই নিজেকে আহুতি দিয়েছিল। তাই সে পরমগতি লাভ করেছিল। ভগবান তাতে (পরমগতি দেওয়ায়) নিজের কোনো কৃতিত্ব মনে করেন না।

কর্ম করার সকল সামগ্রী সংসারের। এই পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর স্থূল সৃষ্টির অংশ, সূক্ষ্ম শরীর সমষ্টি সূক্ষ্ম-সৃষ্টির একটি অংশ এবং কারণ-শরীর কারণ-সৃষ্টির একটি অংশ। সংসারের সামগ্রী দিয়ে কর্ম করে নিজের জন্য ফল চাওয়া এক মহান অনর্থের হেতু। এইটিই অ-সতের, বিনাশশীলের সঙ্গ, এর জন্যই জন্ম-মৃত্যু হয়ে থাকে।

একটি খুবই অদ্ভুত কথা বলছি ! আপনাদের কাছে যতই যোগ্যতা, সামর্থ্য, বস্তু, বিদ্যা, থাকুক তাতে কোনো পার্থক্য হয় না। খুব বড়

বিদ্বানই হোক আর প্রচণ্ড মূর্খই হোক, নিজের জন্য কর্ম না করলে সেও মুক্ত হয়ে যাবে। এতে যোগ্যতা প্রভৃতি কাজে আসবে না, কেননা সেগুলি সবই উৎপন্ন হয় এবং বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেগুলি আসে এবং চলে যায়। অতএব সেগুলির দ্বারা নিত্য অবস্থানকারীকে কি পাওয়া যেতে পারে ? আপনার কাছে ভালো-মন্দ যেমন জিনিসই থাকুক, আপনি যেরকম যোগ্য, যত অধিকারীই হোন, সেইগুলির কোনো প্রয়োজনই নেই। সেগুলির প্রয়োজন তো সেখানেই যেখানে যোগ্যতা, বিদ্যা, বস্তু কাজে আসে। সংসারে আপনার যেমন যোগ্যতা হবে, সামর্থ্য হবে সেইরকমই পাবেন। সংসারে যোগ্যতানুসারে অধিকার পাওয়া যায়। আপনারা কর্ম করবেন, যোগ্যতা প্রয়োগ করবেন, সেই অনুসারে সংসারে ফল আপনারা পাবেন। কিন্তু ভগবৎপ্রাপ্তিতে এইসব জিনিসের কোনো প্রয়োজনই নেই। এখানে কেবল ত্যাগেরই প্রয়োজন।

আপনার কাছে পরিস্থিতি যেমনই হোক, সৌম্য হোক অথবা ভীষণ, তাতেই ভগবৎপ্রাপ্তি হতে পারে। অর্জুনও বলে ফেলেছিলেন, আমাকে যুদ্ধের মতো ভীষণ কর্মে কেন নিযুক্ত করছেন—**'ঘোরে কর্মণি কিং নিয়োজয়সি'** (গীতা ৩।১)। যুদ্ধে দিনভোর তো গলা কাটার দিকেই লক্ষ্য থাকে। এমন হিংসাত্মক কাজ করতে থাকলেও মানুষের কল্যাণ হতে পারে। ভগবান বলেছেন—

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥

(গীতা ২।৩৮)

'জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ সব কিছুকে সমান জ্ঞান করে যুদ্ধ করো। এইভাবে যুদ্ধ করলে তুমি পাপে লিপ্ত হবে না।'

পাপ আছে বৈষম্যে, সাম্যে পাপ নেই। সাম্যের নাম যোগ। তাই সাম্যে স্থিত হয়ে যুদ্ধ করলে পাপ হয় না। বাস্তবে জয়-পরাজয়, লাভ-ক্ষতি এবং সুখ-দুঃখকে সমান করতে হয় না, এইগুলি স্বাভাবিকভাবেই সমান। যেমন, সুখ এলে ভালো লাগে, চলে গেলে খারাপ লাগে এবং

দুঃখ এলে খারাপ লাগে, চলে গেলে ভালো লাগে। একদিকে সুখ ভালো, অন্য দিকে দুঃখ ভালো। একদিকে সুখ খারাপ, অন্যদিকে দুঃখ খারাপ। সুখ আর দুঃখের মধ্যে প্রভেদ কোথায় ? এই দুটিতে যে রাগ-দ্বেষ করা হয় সেইটিই কর্মযোগের প্রধান বাধা। রাগ-দ্বেষের কারণেই মানুষ কর্মের দ্বারা লিপ্ত হয়ে যায়, বন্দি হয়ে যায়।

কর্মযোগের মহিমা জানিয়ে ভগবান পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে বলেছেন—'যে কাউকে দ্বেষ করে না এবং কোনো কিছু ইচ্ছা করে না তাকে নিত্য সন্ন্যাসী বলে মনে করা হয়। কেননা দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত মানুষ সুখপূর্বক সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে হয়।' যে রাগ-দ্বেষ করে না সেই কর্মযোগী নিত্য সন্ন্যাসী। লাভ-ক্ষতি, সুখ-দুঃখ, মান-অপমান, নিন্দা-স্তুতি, জীবন-মৃত্যু প্রভৃতির দ্বন্দ্ব থেকে রহিত হওয়ায় তিনি সুখপূর্বক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যান। সমস্ত দ্বন্দ্ব প্রকৃতিতে। দ্বন্দ্বরহিত হলে স্বরূপে স্থিতি স্বতই হয়ে যায়। মানুষ দ্বন্দ্বরহিত কখন হয় ? যখন সে নিজের জন্য কিছুই করে না।

যখন মানুষ নিজের জন্য কর্ম করে তখন তার প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে যায়। প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ জন্ম-মৃত্যু দেয়। যে নিজের জন্য কিছুই করে না তাকে কেউ জন্ম-মৃত্যু কী করে দিতে পারে ? পৃথিবীতে যত কর্ম হয়ে থাকে তার পাপ-পুণ্য আমাদের লাগে না। আমরা নিজেদের জন্য যা করি তারই পাপ-পুণ্য আমাদের হয়। আমরা যদি নিজেদের জন্য কিছুই না করি তাহলে কোনো পাপ-পুণ্যই আমাদের হবে না। নিজেদের জন্য যাই করি বা যাই চাই তাতে যোগ হবে না। বরং তাতে ভোগ হবে এবং কর্মের দ্বারা বন্ধন হবে—

'কর্মণা বধ্যতে জন্তুঃ।'

আমি তো সহজ সরল কথাই বলছি যে, আপনারা যদি গৃহে থাকেন তাহলে বাড়িতে থাকবার বিদ্যা শিখে নিতে হবে। খুবই সহজ সরল বিদ্যা। আপনি যদি শাশুড়ি হন, তাহলে ভাববেন, 'আমি ছেলে-বৌমার জন্য মা এবং শাশুড়ি, ওরা আমার জন্য নয়।' আপনি যদি বউমা হন তাহলে

ভাববেন, 'আমি শ্বশুর-শাশুড়ির বৌমা, ওরা আমার জন্য নয়।' আপনি যদি স্বামী হন তাহলে ভাববেন 'আমি আমার স্ত্রীর জন্য স্বামী, সে আমার জন্য নয়।' এই ধারণাটি করে নিন, 'আমি ওদের জন্য, ওরা আমার জন্য নয়।' ওরা আমার জন্য—অন্তর থেকে এই ভাব যদি দূর করে দেন তাহলে আপনার সব কামনা মিটে যাবে। এইটি গৃহে থাকার, সংসারে থাকার আসল বিদ্যা।

যদি শিষ্য হয়ে থাক তাহলে গুরুর জন্যই হয়েছ। গুরুর কাছে তোমার কোনো প্রয়োজন নেই। গুরু আমার জন্য নয়, আমিই গুরুর জন্য। পিতা আমার জন্য নয়, আমিই পিতার জন্য। আমার জন্য পুত্র নয়, পুত্রের জন্যই আমি। সংসারের সঙ্গে আপনার যত সম্পর্ক সেইসব সম্বন্ধ কেবল তাদের সেবা করবার জন্য, নেওয়ার জন্য কোনো সম্বন্ধ নেই। নেওয়ার ইচ্ছাই ত্যাগ করুন। তাহলে কী হবে ? যিনি সর্বত্র বিরাজমান, সকল সময়ে বিদ্যমান, সকলের জন্য এবং সকলের মধ্যে যিনি বিদ্যমান তাঁকে পেয়ে যাবেন।

যদি সাধু হই তো গৃহস্থ আমার জন্য নয়। আমিই গৃহস্থের জন্য। তারা আমার জন্য নয়, আমিই তাদের জন্য—শুধু এইটুকুই কথা। এটি খুবই সাধারণ কথা। কিন্তু খুবই লাভদায়ক। যদি সকল প্রাণীর সেবা করাই আপনার লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে আপনার বন্ধন হবে না। এতে অর্থ, বিদ্যা, যোগ্যতা প্রভৃতি কিছুরই প্রয়োজন নেই। তিনিই কর্মযোগী যিনি যে কোনো পরিস্থিতিতেই কেবল অপরের হিতে রত থাকেন।

আমরা আগে নিজেদের সুখের জন্যই সব কিছু করেছি। তাই অপরের সুখের জন্য এখন করতে হবে, নইলে এইসব কিছু করার দরকার ছিল না। সেবা করলে পুরাতন ঋণ শোধ হয়ে যাবে আর নতুন করে ঋণ না করলে কী হবে ? যেমন, কোনো দোকানদার যদি দোকান তুলে দিতে চায় তাহলে তার কাছে যার ঋণ আছে তাকে শোধ করে দিতে হবে আর অন্যের কাছে যে পাওনা আছে তা আদায় করে নিতে হবে নয়তো ছেড়ে দিতে হবে। এরকম করলে দোকান উঠে যাবে। যদি সকলের কাছ থেকে

টাকা উসুল করতে চান তাহলে দোকান বন্ধ করা যাবে না। এইরকমেই অপরের হিতসাধন করে ঋণ শোধ করে দিন। তাতে মহত্ত্ব কিছু নেই। নতুন ঋণ করতে হবে না অর্থাৎ কারও কাছে বিন্দুমাত্র চাওয়ার কিছু নেই। নতুন ঋণ করলেন না, পুরাতন ঋণ শোধ করে দিলেন তাতে যদি মুক্ত না হন তাহলে আর কী হবে ?

অপরের কতটা হিত করবেন ? নিজের শক্তি অনুসারে। মালের উপর কর চাপানো হয়। ইনকাম (আয়)-এর উপর কর চাপানো হয়। অপরের জন্য যতটা করতে পারেন করে দিন, আপনাদের কাজ সমাপন হবে। যার ক্ষমতা নেই তার কাছে কোনো আশা থাকে না। আমার কাছে আপনারা শুনবার আশা করেন। যাঁরা আমাকে জানেন তাঁরা কি এমন আশা করতে পারেন যে স্বামীজী তাঁদের দশ হাজার টাকা দেবেন ? আমার কাছে যা নেই আমার কাছে তা পাবার আশা আপনারা করেন না। তেমনই যে জিনিস আপনাদের কাছে নেই তার আশা কি ভগবানের কাছে থাকতে পারে ? ভগবান কি আপনাদের মতোও বুঝদার নন ? আপনারা যতটা করতে পারেন তা করতে যেন কার্পণ্য না থাকে।

আপনাদের কাছে চারটি জিনিস আছে—সময়, বুদ্ধি, সামগ্রী এবং সামর্থ্য (শক্তি)। আপনাদের কাছে এই চারটি জিনিস যতটা আছে ততটাই যদি অপরের হিতে লাগান তাহলে কল্যাণই হবে। আপনাদের কাছে যতটা আছে ততটাই লাগিয়ে দেবেন এই আশা ভগবান করেন এবং সংসারও তাই করে। তার চেয়ে বেশি আশা যদি কেউ করে তবে সেটি তার ভুল। সময় যদি সবটাই লাগিয়ে দেন তাহলে আরও সময় পাবেন কোথায় ? চব্বিশ ঘন্টাই দিয়ে দিয়েছেন। এখন পঁচিশ ঘন্টা কোথায় পাবেন ? যতটা বুদ্ধি, সামগ্রী, সামর্থ্য আছে তার সবটাই যদি মানুষের হিতে লাগিয়ে দেন তাহলে অতিরিক্ত পাবেন কোথায় ? আপনাদের কাছে যা কিছু আছে তাকে অপরের হিতার্থে নিযুক্ত করার ভাব এমন হোক যে এর কোনো কিছুই আমার বা আমার জন্য নয়, এ

সবই অপরের এবং অপরের জন্য। তাহলে অসংলগ্নতা নিজে থেকেই প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

অসংলগ্নতা আমাদের স্বরূপ—**'অসঙ্গো হি অয়ং পুরুষঃ'** (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৪।৩।১৫)। যে অসংলগ্নতা জ্ঞানযোগীরা চিন্তার মাধ্যমে প্রাপ্ত হন সেই অসংলগ্নতা কর্মযোগীরা অপরের জন্য কর্ম করে প্রাপ্ত হন। নীচের দুটি শ্লোককে খুব মন দিয়ে পড়ুন, স্মরণে রাখুন—

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্‌॥
যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

'অবুঝ লোকেরাই সাংখ্য (জ্ঞানযোগ) এবং যোগ (কর্মযোগ)-কে আলাদা বলে থাকেন। পণ্ডিতরা তা বলেন না। তার কারণ এই দুটির যে কোনো একটিতেও ভালোভাবে স্থিত মানুষ দুটিরই ফলস্বরূপ পরমেশ্বরকে পেয়ে যান। জ্ঞানযোগী যে তত্ত্বকে লাভ করেন কর্মযোগীও সেই তত্ত্বকেই লাভ করেন। অতএব যে মানুষ জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগকে ফলরূপে একই দেখেন, তিনিই সঠিক দেখেন।'

এই শ্লোকটির আলোচনান্তে এর বিরোধিতা কোনো লেখা-পড়া জানা মানুষই করতে পারে না। এমনই যথার্থ এই শ্লোকের কথাগুলি। জ্ঞান ছাড়া মুক্তি হতে পারে না, কর্মযোগের দ্বারা অন্তরের কলুষ দূর হয়— একথা যদি মেনে নেন তো কোনো আপত্তি নেই। কেননা এই সিদ্ধান্তকেও আমি মানি, এতে আমার বিরোধ নেই। তবে একটি কথা আরও বেশি মানি তা হল কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ তিনটি সাধনাই স্বতন্ত্রভাবে মুক্তি আনে। গীতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি॥

(গীতা ৫।৬)

'হে মহাবাহো ! কর্মযোগ ছাড়া জ্ঞানযোগ সিদ্ধ হওয়া কঠিন। মননশীল কর্মযোগী শীঘ্রই ব্রহ্মকে লাভ করেন।'

এজন্য নিজের স্বার্থ, অভিমান, আসক্তির কামনাকে ত্যাগ করতে হবে। কেননা এইগুলি সংসারের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ জুড়ে দেয়। মনে রাখবেন যে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ আমরা নিজেরা জুড়ে দিই। কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ স্বত স্বাভাবিক, তা আমাদের জুড়ে দেওয়া নয়। এর মধ্যেও যে কথা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তা হল এই যে বস্তু, শরীর, মানুষ—কোনো কিছুই আপনাদের বাঁধেনি, আপনাদের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত করেনি। আপনারাই সেগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়েছেন। তাই আপনারা যদি চান তাহলে এই সম্বন্ধ ত্যাগ করতে পারেন।

টাকা-পয়সা কখনো বলেনি যে আমি তোমার, তুমি আমার। ঘর-বাড়ি কখনো বলেনি যে আমি তোমার, তুমি আমার। আপনি নিজেই 'আমার টাকা, আমার বাড়ি, আমার শরীর, আমার মন, আমার বুদ্ধি, আমার অহংকার'—এইভাবে আপনত্ব করেছেন। তাই আপনাকেই এই সম্বন্ধ অন্তর থেকে ত্যাগ করতে হবে। প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য (শরীর-সংসার) কখনো আপনাকে নিজের বলেনি, কখনো আপনাকে নিজের বলে মানেনি। সেগুলি তো দ্রুততার সঙ্গে চলে যাচ্ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে। আপনারা সেগুলিকে নিজের বলে মনে করেন—এইটিই হল বন্ধন। আপনারা সেগুলিকে নিজেদের বলে মনে না করে সেবাতে যদি নিয়োগ করেন তাহলে তার সকল প্রবাহ সংসারের দিকে চলে যাবে আর আপনারা স্বয়ং যেমনকার তেমনই নির্লিপ্ত থেকে যাবেন।

শ্রোতা—অন্তরে যে অজ্ঞতা তা দূর করতে কী করব ?

স্বামীজী—যেসব কাজ স্থূল শরীরের দ্বারা করা যায়, সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা যে চিন্তন করা যায় এবং কারণ শরীরের দ্বারা যে সমাধি হয় সেই সবকে যদি সংসারের হিতের জন্য ধরা হয় তাহলে সমস্ত অজ্ঞানতা দূর হয়ে যাবে। জড়তার সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ এবং চিন্ময় তত্ত্বে স্বত জাগৃতি হবে।

আপনাদের কাছে যে অর্থ, পদ আছে তা মোটেই আপনাদের নিজেদের জন্য নয়। সেগুলিকে নিজেদের বলে মেনেছেন—এইটিই হল বিশ্বাসঘাতকতা। এই বিশ্বাসঘাতকতাকে দূর করতে হবে, আর কিছু করতে হবে না। সাধক হয়েছেন, বিশ্বাসঘাতকতার অপনোদন করছেন না, আর কল্যাণ চাইছেন ! স্থূল শরীরকে নিজের বলে মনে করা বেইমানি, সূক্ষ্ম শরীর এবং কারণ শরীরকেও নিজের মনে করা বেইমানি। স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ—এই তিনটি শরীরেই সম্বন্ধ সংসারের সঙ্গে, আপনাদের সঙ্গে নয়। এই তিনটি আপনাদের নয়, আপনারাও এগুলির নন।

যদি পাপের ফল (দুঃখ) না চাইতেই আমরা পাই তাহলে পুণ্যের ফলও (সুখ) না চাইতে আমরা পাব না কেন ? তা আমরা অতি অবশ্যই পাব। ব্যাধি কি কখনো চাওয়া হয় ? তার জন্য কি চেষ্টা করা হয় ? জ্যোতিষীকে কি কখনো জিজ্ঞেস করেন যে অসুখ তো হল না, কী করা যাবে ? মহারাজ ! বলুন তো কবে অসুখ হবে ? পাঁচ-ছ বছরে আমাদের বাড়ির কেউ মারা যায়নি—কে কবে মারা যাবে, এমন ইচ্ছা কি হয় ? দশ বছর ধরে ব্যবসায়ে কোনো ক্ষতি হয়নি। কবে হবে, এরকম ইচ্ছা কি হয় ? ক্ষতির জন্য কি কোনো চেষ্টা করা হয় ? তাহলেও কি ক্ষতি হয় না ? তাৎপর্য হল না চাইতে যেমন দুঃখ আসে তেমনই না চাইতে সুখও পাওয়া যায়। তাহলে সুখের বাঞ্ছা কেন ?

যিনি পাপের ফল জোর করে ভোগান এবং পুণ্যের ফলের জন্য আমাদের নাকখত দেওয়ান তিনি কী করে ভগবান হতে পারেন ? তিনি যদি আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে চান তাহলে আমাদের খাদ্য দিন, নইলে আমাদের বেঁচে থাকার কী এমন গরজ ? কোনো জিনিসের জন্য আমরা কেন তাঁকে বলব ? আমাদের অপেক্ষা তাঁর গরজই বেশি। এইজন্য নিঃশঙ্ক হয়ে যান, নিশ্চিন্ত হয়ে যান, নির্ভয় হয়ে যান এবং নিঃশোক হয়ে যান। শঙ্কা নয়, চিন্তা নয়, ভয় নয়, শোক নয়। তৎপরতার সঙ্গে নিজের

কর্তব্যকর্ম করুন—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্‌কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ॥
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্‌কর্তুমর্হসি॥
(গীতা ৩।১৯-২০)

'তুমি সদাসর্বদা আসক্তিরহিত হয়ে যথাযথভাবে কর্তব্যকর্মের আচরণ করো, কেননা আসক্তিরহিত হয়ে যে মানুষ তা করে সে পরমাত্মাকে লাভ করে। রাজা জনকের মতো অনেক মহাপুরুষও কর্মের দ্বারা পরমসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাই লোকসংগ্রহের দৃষ্টিতে তুমিও (নিষ্কামভাবে) কর্ম করার যোগ্য।'

কর্মযোগের তেমন প্রচার নেই, গ্রন্থ নেই, জ্ঞাতা নেই—তাই একে কঠিন বলে মনে হয়। বাস্তবে এতে কঠিনতা নেই। কর্মযোগ খুবই সহজ, সরল। করতে চাইলে এ সহজ হয়ে যায়। কামনা থাকায় প্রথমে একে কঠিন বলে মনে হবে, কিন্তু কামনা ত্যাগ করলে এ সহজ হয়ে যাবে। কর্মযোগ খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

গীতা খুবই অলৌকিক। গীতা বলেছে যে আপনি যেখানে আছেন, যে বর্ণে, যে আশ্রমে, যে পরিস্থিতিতে আছেন কেবল তারই সদ্ব্যবহার করুন। তাতেই মুক্তি হয়ে যাবে! কোথাও যেতে হবে না, বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায় বদলাতে হবে না, দেশ, বেশও বদলাতে হবে না। বদলাতে হবে মনের ভাব। কেবল প্রাপ্ত পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করতে হবে।

সেবা কী করে করব ?

শ্রোতা—সেবা করবার জন্য আমাদের কাছে অর্থ নেই, বল নেই, বুদ্ধি নেই, যোগ্যতা নেই, সামর্থ্য নেই, কোনো জিনিসই আমাদের কাছে নেই। কিন্তু আমরা সেবা করতে চাই। তাহলে কী করব ?

স্বামীজী—খুব ভালো প্রশ্ন। এর উত্তরও অসামান্য। মন দিয়ে শুনুন। সেবা করার অর্থ—অন্যের হিত সাধন করা, অন্যকে প্রসন্ন করা। বর্তমানে সে যেন প্রসন্ন হয় এবং পরিণামে তার যেন হিত (কল্যাণ) হয়। এছাড়া সেবা আর কী হতে পারে ?

যখন আমাদের কাছে শক্তিই নেই তখন অন্যের প্রসন্নতা কী করে আনব। এই প্রসঙ্গে আমার দৃষ্টিতে একটি খুব বড় কথা জানাচ্ছি। একজন ধনী লোক। তার খুব লোকসান হল, খুব সাংঘাতিক অসুখ হল, ছেলে মারা গেল। এইরকম অবস্থায় আপনি তার দুঃখে সহানুভূতিশীল হন—'আপনার ছেলে মারা গিয়েছে খুবই দুঃখের কথা। আপনার ক্ষতি হয়েছে এটা ভালো হয়নি।' এইভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে তার দুঃখে সমব্যথী হন। তাহলে সে প্রসন্ন হবে, তার সেবা করা হবে। অনুরূপভাবে, কারো প্রচুর ধনসম্পদ হল, ছেলে খুব বুদ্ধিমান হল, তাই দেখে নিজ অন্তরে আনন্দিত হন আর বলুন 'বাঃ বেশ হয়েছে।' তাতে সে প্রসন্ন হয়ে যাবে।

সাধুদের সম্বন্ধে বলা আছে—**'পর দুখ দুখ সুখ সুখ দেখে পর'** (শ্রীরামচরিতমানস ৭।৩৮।১)। অন্যের দুঃখে দুঃখিত হওয়া, অন্যের সুখে সুখী হওয়া—এই সেবা আপনি টাকা-পয়সা, শক্তি, বস্তুসামগ্রী ছাড়াই করতে পারেন। অপরের দুঃখে দুঃখিত হয়ে বলুন, 'হে প্রভু, কী করি ! আমার কাছে টাকা-পয়সা, বস্তু, বল কিছুই নেই যার দ্বারা দুঃখীকে

সুখী করতে পারি। আমি কী করব ?' এইভাবে আপনি আন্তরিকভাবে দুঃখিত হন আর অন্যকে সুখী দেখে অন্তরে প্রসন্ন হয়ে যান। এইটিই হবে আপনার খুব বড় সেবা করা। এমন মানুষকে দেখা মাত্র লোকেরা শান্তি পাবে।

অর্থাদির দ্বারা আমরা লোকেদের সেবা করব, তাদের উপকার করব—এটি খুবই স্থূল বুদ্ধি। আমি তো বলি এ হল নীচ বুদ্ধি। আপনারা সেবাকে গুরুত্ব দেননি, দিয়েছেন অর্থকে। যারা অর্থকে গুরুত্ব দেয় তারা নীচ। যা আপনার হাতের ময়লা তাকে নিজের থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া এবং লোকেদের সেবার জন্য তার প্রয়োজনীয়তা মেনে নেওয়া খুবই তুচ্ছ (খারাপ) বুদ্ধি। অর্থাদির দ্বারা সেবা করলে অহংকার হয়, যার সেবা করা হয় তাকে খাটো মনে করা হয়। যার সেবা করবেন তার উপর এই দাপট দেখাবেন যে আপনি তাকে এত দিয়েছেন, তার এতটা সহায়তা করেছেন। সে যদি আপনার বিরোধী হয় তাহলে এই বলে আপনি তার নিন্দা করবেন, 'দেখো, আমি এর এত সহায়তা করেছি কিন্তু এ আমার বিরোধিতা করছে।' এইভাবে সংঘর্ষ সৃষ্টি হবে। আপনি আপনার বিদ্যাবত্তা দিয়ে সেবা করবেন আর অন্যেও যদি তাই করে তাহলে পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা সৃষ্টি হবে। আমি সুন্দর বক্তৃতা দিই কিন্তু আর কেউ যদি আমার চেয়ে ভালো বক্তৃতা দেয় তাহলে ঈর্ষা হবে। বলে থাকেন যে জনগণের সেবা করছেন, কিন্তু বাস্তবে এ সেবা নয়, যা করেন তা হল লড়াই।

বাস্তবে সেবা করে এমন লোক খুবই কম পাওয়া যাবে। আমরা রাম-নামের মাহাত্ম্য জানাই, লোকেদের নাম-জপ করতে বলি, কিন্তু যদি অন্য কেউ লোকেদের নাম-জপ করতে নিযুক্ত করে তাহলে সেটা আমাদের পছন্দ হয় না। আমাদের কথায় যদি কেউ নাম-জপে লেগে যায় তাহলে আমরা খুশি। কিন্তু অন্যের কথায় যদি কেউ নাম-জপ শুরু করে তাহলে আমরা খুশি হই না। কিন্তু আমাদের এতে বেশি খুশি হওয়াই এইজন্য উচিত যে আমাদের পরিশ্রম করতে হল না, কিন্তু কাজ হয়ে গেল।

ধরুন, কোনো লোক আমাদের মত মানে না, আমাদের সিদ্ধান্ত মানে না, বরং আমাদের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করে, আমাদের মান্যতাকে, আমাদের সিদ্ধান্ত-পদ্ধতিকে খণ্ডন করে, কিন্তু রামনাম প্রচার করে, লোকেদের নাম-জপ করতে বলে—তাহলে তাকে আমাদের কেমন লাগবে ? নামের প্রচার তো আমাদের ভালোই লাগবে, কিন্তু তার কথায় লোকেরা নাম-জপ করে, এটি ভালো লাগবে না। কেননা সেই লোকটি আমাদের সিদ্ধান্ত, আমাদের মত, আমাদের সাধন-প্রণালীকে খণ্ডন করে। এইভাবে আমরা খণ্ডনকে যতটা গুরুত্ব দিই, নামের প্রচারকে ততটা গুরুত্ব দিই না। আমরা নামের প্রেমী নই, আমরা নিজের মতের, নিজের গুরুর প্রেমী। আমাদের গুরুকে যদি মানো তাহলে ঠিক আছে। কিন্তু যদি আমাদের গুরুকে না মানো আর রাম-রাম করো তো তাতে কিছুই হবে না—এ হল মতাবলম্বীদের কথা। যদি বাস্তবে নামের মহিমাই আমাদের অভীষ্ট হয় তাহলে প্রচণ্ড কোনো নাস্তিক, ভীষণ নীচ মানুষও যদি নামের মহিমার কথা বলে তাহলে মনে মনে আমাদের আনন্দিত হওয়া উচিত। হৃদয়ে উল্লাস হওয়া উচিত। এর জন্য সাধুবাদ দেওয়া উচিত। এরই নাম সেবা।

অন্যের সদাব্রতটি বেশ ভালোই চলে, ভালো খাবার দেয়, সকলকে যত্ন করে, লোকেরা তার গুণ গায়। আমিও যদি সদাব্রত খুলি এবং তার মহিমা যদি না হয় তাহলে আমার মনে হিংসা হয়, কি না ? যদি হিংসা হয় তাহলে আমার দ্বারা ভালো সেবা করা হল না। বাস্তবে সেখানে ভালো খাবার দেওয়া হয় আর আমার এখানে সাধারণ খাবার দেওয়া হয় বলে আমার তো আনন্দিতই হওয়া উচিত। আমি উপকার করার যে কাজটি করি সেইকাজ যদি অন্য কেউ শুরু করে দেয় আর তাতে আমার মনে হিংসার উদ্রেক হয় তাহলে আমার সেই সেবা প্রকৃত নয়, তা হল সেবার মিথ্যা ধারণা।

যে কোনো ভাবে যে কেউ সেবা করুন না কেন তাতে আমাদের প্রসন্ন হয়ে যাওয়া উচিত। সেটিকে দেখে এবং যাদের সেবা করা হচ্ছে তাদের

দেখে এই রকমই মনে করা উচিত যে, বাঃ, কী সুন্দর কাজ হচ্ছে। আমাদের কাছে যদি সেবা করার জন্য একটা কানা কড়িও না থাকে কিন্তু আমরা যদি প্রসন্ন হয়ে যাই তাহলে আমাদের দ্বারা সেবা করা হবে। এটিতে কী কঠিনতা আছে, বলুন ! এর জন্য কোনো বস্তু সামগ্রীর প্রয়োজন নেই, চাই নিজের হৃদয়। বস্তুর দ্বারা সেবা হয় না, তা হয় হৃদয়ের দ্বারা।

লোকেদের মনে এই একটা ভুল ধারণা আছে যে যদি এত টাকা-পয়সা হয়ে যায় তাহলে আমরা এত এত সেবা করব। চিন্তা করে দেখুন যে যাদের কাছে অনেক টাকা আছে তারা কি সেবা করে ? তারা তো সেবা করে না, তবে আমরা করব ! টাকা-পয়সা হলে দেখবেন, তখন আর সেবা করা হবে না। যখন টাকা-পয়সা হবে তখন আর এই ভাব থাকবে না। ভাবনা বদলে যাবে। আমি এমন মানুষ দেখেছি, কেবল বই-এর কথা বলছি না। কলকাতার এক সজ্জন দালালী করতেন এবং হরিদ্বারে, ঋষিকেশে সৎসঙ্গের জন্য যেতেন। বেশ ভালো স্বভাব ছিল তাঁর। তিনি বলতেন, আমি তো দালালি করি এবং সেটি ছেড়ে সৎসঙ্গে চলে আসি। কিন্তু এদের কাছে এত টাকা, তবু এরা সৎসঙ্গে আসে না। এদের কোথায় বাধা ? পরে তার যখন টাকা-পয়সা হল তখন তাঁর সৎসঙ্গে আসা কমে গেল। সৎসঙ্গে আসবার সময় তিনি পেতেন না। কারণ ধন বৃদ্ধি হলে ব্যবসা বড় হয় আর ব্যবসা বড় হলে সময় কম পাওয়া যায়। অতএব যতক্ষণ টাকা-পয়সা থাকে না ততক্ষণ এক রকম ভাবনা থাকে, আর টাকা-পয়সা হয়ে গেলে সেইরকম ভাবনা আর থাকে না। কারো কারো অবশ্য এই ভাবনা থেকে যায়। তাঁরা হলেন বীরশ্রেষ্ঠ। তাঁরা অর্থকে হজম করে নিয়েছেন। প্রায়শই অর্থ হজম হয় না, অজীর্ণ হয়। শক্তিরও অজীর্ণ হয়। প্রথমে মনে হয় যে শক্তি হলে আমরা এতসব করব। কিন্তু শক্তি হলে দুর্বলকে দমাতে থাকেন। যখন ভোট চান তখন বলা হয় যে আপনাদের সেবার জন্য এত সব কাজ করব। কিন্তু মন্ত্রী হয়ে গেলে আর জিজ্ঞেসও করবেন না। এ কি সেবা ? এ সেবা নয়, এ হল স্বার্থ। একজন নেতা

একটি গ্রামে গিয়েছিল। সে সেখানকার লোকেদের বলল, তোমাদের গ্রামে এত নোংরা, পরিষ্কার করবার জন্য মেথর কি আসে না ? তারা বলেছিল, পাঁচ বছর পরে পরে মেথর আসে। আগে কেউই আসত না। যখন ভোটের সময় হয়, তখন আসে।

অন্যে সেবার কাজ করলে আমাদের কি খারাপ লাগে ? এইজন্য যে আমাদের মহিমা হল না, তাঁর মহিমা হল। তিনি অন্নসত্র খুলেছেন, বিদ্যালয় খুলেছেন, বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন—তাতে তাঁর মহিমা হল, আমার হল না। এটি কি সেবা করা, না নিজের মহিমা চাওয়া। কষ্টি পাথরে যাচাই করলে বুঝতে পারবেন, সেবার অছিলা মাত্র। ভালোর বেশে খারাপের অবস্থান—**'কালনেমি জিমি রাবন রাহূ'** উপরে ভালোর কথা, অন্তরে নীচতা। এই নীচতা ভয়ংকর। যে নীচতা প্রশস্ত (প্রত্যক্ষ) তা ওই নীচতার মতো ভয়ংকর হয় না।

যাঁর মধ্যে প্রকৃত সেবা করবার ভাব থাকবে তিনি অপরের দুঃখে দুঃখী এবং অপরের সুখে সুখী হয়ে যাবেন। অপরের দুঃখে দুঃখী এবং অপরের সুখে সুখী না হয়ে কেউ কি সেবা করতে পারে ? যতক্ষণ পর্যন্ত অপরের দুঃখে দুঃখী এবং অপরের সুখে সুখী না হচ্ছেন ততক্ষণ সেবা হবে না। যিনি অপরের দুঃখে দুঃখী হবেন এবং নিজের সুখ অপরকে দেবেন তিনি নিজে সুখ নেবেন না, আবার যিনি অপরের সুখে সুখী হবেন তাঁকে নিজের সুখ সংগ্রহ করতে হবে না। এই কথাটি কণ্ঠস্থ করে নিন যে, যারা অপরের দুঃখে দুঃখিত হয় তাদের নিজের দুঃখে দুঃখিত হতে হয় না। তেমনই যারা অপরের সুখে সুখী হয় তাদের নিজেদের সুখের জন্য ভোগ এবং সংগ্রহ করতে হয় না।

সংসারের দ্বারা প্রাপ্ত সামগ্রীকে নিজের মনে করে সেবায় লাগালে অহংকার হবে। অতএব সেবার জন্য সামগ্রীর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন হৃদয়ের।

কর্ম কার জন্য ?

আপনারা দয়া করে এই কথাটি বুঝবার চেষ্টা করুন, এর অপব্যবহার করবেন না। এটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা। কথাটি হল, নিজের জন্য কিছু করতে হবে না। 'নিজের'—এর অর্থ হল স্বয়ং। অর্থাৎ পরমাত্মার অংশ চেতন স্বয়ং-এর জন্য কিছু করার নেই। যা কিছু করা হয় তা সবই প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধজনিত। প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকলে কিছু করারই নেই। তাই যা কিছু করার তা সবই শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির জন্য। সংসারের জন্য করতে হয়, ভগবানের জন্য করতে হয়। কিন্তু নিজের জন্য কিছুই করতে হয় না। এটিই হল সার কথা।

আমরা যে কাজই করি তার আরম্ভ ও শেষ আছে। যার আরম্ভ এবং শেষ আছে তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই। কেননা স্বয়ং-এর আরম্ভ এবং শেষ নেই। এই জীব অনন্তকাল ধরে চলে আসছে। এর কখনো আরম্ভ হয়নি, শেষও হয়নি। এটি অনাদি এবং অনন্ত। সুতরাং এর জন্য কিছু করতে হয় না। কেবল সংসারের জন্যই কিছু করতে হয়।

আমি যেন কিছু পাই—এই ইচ্ছা হওয়া মাত্র বন্ধন হয়ে যায়। প্রাপ্ত জিনিস কখনো নিজের সঙ্গে থাকে না। দয়া করে এই কথাটিতে মন দিন। আমরা যা কিছু পাই—অর্থ, মান, বিদ্যা, অধিকার—এইসব কিছু প্রাপ্ত বস্তু আমাদের সঙ্গে থাকতে পারে না। কিন্তু পরমাত্মাকে সকলেই পান। তিনি সকলের সঙ্গে সব সময় থাকেন, কখনো ছেড়ে চলে যান না। তাঁকে না জানার জন্য তাঁকে অবিদ্যমান বলে মনে হয়। কোনো দেশে, কালে, বস্তুতে, ব্যক্তিতে, ক্রিয়ায়, ঘটনায়, পরিস্থিতিতে পরমাত্মা নেই—এমন নয়, এমন হতেই পারে না। তিনি চিরকালীন, তাঁকেই পেতে হবে। যাকে

পাওয়া যায় এবং যা ছেড়ে যায় এমন জিনিসের আশ্রয় নেওয়া খুবই অনর্থের কারণ। প্রাপ্ত শরীর, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ প্রভৃতি নিজেদের জন্য নয়। এগুলিকে নিজেদের জন্য মনে করাই ভুল। এই বিষয়টিকে ভালোভাবে বোঝা উচিত।

ভগবান বলেছেন—**'মমৈবাংশো জীবলোকে'** (গীতা ১৫।৭) 'এই জীব আমারই অংশ।' এই জীব চেতন, অমল এবং সহজ সুখরাশি—**'ঈশ্বর অংশ জীব অবিনাশী। চেতন অমল সহজ সুখ রাসী॥'** (শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ১১৭।১)। এর মধ্যে জড়তা নেই, তাহলে এর জন্য কী করা বাকি থাকল ? এতে মল নেই, তাহলে কী দূর করতে হবে ? এ সহজ সুখরাশি, তাহলে এর জন্য কোথা থেকে সুখ আনবে ? যে জিনিস প্রাপ্ত হয় তার বিচ্ছেদও হয় ? প্রাপ্ত জিনিসের আশ্রয় নেওয়ার তাৎপর্য হল সেগুলির ভরসা রাখা, সেগুলি থেকে সুখের আশা করা, সেগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া—এ হল মহা পতনের কারণ। আপনারা যদি এই কথাটি দয়া করে বুঝে নেন তাহলে খুবই আনন্দের কথা !

প্রাপ্ত জিনিস আমাদের কাছে থাকে না। তার কারণ প্রাপ্ত তাকেই বলে যা আগে ছিল না, পরেও থাকবে না। কিন্তু পরমাত্মা এবং তাঁর অংশ জীবাত্মা (স্বয়ং) আগেও ছিলেন এবং পরেও থাকবেন। শরীর, ধন-সম্পত্তি, ঘর-পরিবার প্রভৃতি প্রাপ্ত জিনিসের আশ্রয় নেওয়া, তাদের গুরুত্ব দেওয়া চরম পতনের কারণ। যেসব বস্তু পাওয়া যায় আবার চলেও যায় ; সেগুলি যে চিরকাল থাকে তার কী কাজে লাগবে ? তবে এগুলির সদ্ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এদের আশ্রয় নেওয়া এবং এগুলির কাছ থেকে সুখের আশা করা ভুল। বিশেষ ভুল হল এই যে, আমরা প্রাপ্ত জিনিস থেকে সুখ নিই। এই সুখের আসক্তিই বন্ধনকারী। এই আসক্তি সাধনাকে উঁচুতে উঠতে দেয় না।

যে কাজই করুন না কেন, তা না করা থেকে আরম্ভ হয় এবং না করতেই তা শেষ হয়ে যায়। অতএব কর্মের আদি এবং অন্ত হবেই। এই রকম কর্মের দ্বারা যা পাওয়া যাবে তারও আদি-অন্ত থাকবে। ক্রিয়ারও

আরম্ভ ও শেষ হয়। আবার পদার্থেরও সংযোগ ও বিয়োগ হয়। ক্রিয়া এবং পদার্থ—এগুলি প্রকৃতি। প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণরূপে অতীত যে পরমাত্মতত্ত্ব তারই সাক্ষাৎ অংশ হল এই জীবাত্মা। সুতরাং যারা ক্রিয়াগুলির প্রতি এবং বস্তুগুলির প্রতি আসক্ত এবং এগুলি থেকে নিজেদের উন্নতি মনে করেন তাঁরা ভুল করেন।

এটি খুবই আশ্চর্যের কথা যে অর্থ লাভ হলে আমরা নিজেদের বড় মনে করি। অর্থের জন্য যদি আমরা বড় হই তাহলে অর্থ বড় হল, না আমরা বড় হলাম ? অর্থের অভাবে আমরা তো ছোটই হলাম। অর্থ তো আপনাদের অর্জিত। অর্থ আপনাদের কাছে আসে, আবার চলে যায়। অর্থ যদি আপনাদের কাছে থাকেও, তবুও আপনারা চলে যাবেন। এ সঙ্গে থাকার জিনিস নয়। এইভাবে বিদ্যা, যোগ্যতা, পদ, অধিকার প্রভৃতির দ্বারা যাঁরা নিজেদের বড় মনে করেন তাঁরা খুবই ভুল করেন। বাস্তবে আপনারা স্বয়ং এত বড় যে আপনাদের জন্যই এই বস্তুগুলি সার্থক হয়। আপনাদের জন্যই অর্থ সার্থক, আপনাদের জন্যই খাদ্য, বস্ত্র সার্থক হয়ে থাকে। এই সমস্ত বস্তু প্রভৃতি অর্জন করে নিজেদের বড় মনে করা—এটি মস্ত বড় ভুল। প্রাপ্ত বস্তুর দ্বারা নিজেকে গুরুত্ব দেওয়া, নিজেদের বড় মনে করা খুবই ভ্রমাত্মক। যদি এই ভ্রম বিদুরিত হয় তাহলে সমতা নিজে থেকেই এসে যাবে। কেননা সমতাতে আমাদের স্থিতি স্বত স্বাভাবিক। এটি উদ্যোগসাধ্য, কৃতিসাধ্য নয়। করার আসক্তি দূর করার জনাই কর্ম করতে হয়, কিছু পাওয়ার জন্য নয়।

আমাদের সম্মান হওয়ায় আমাদের আনন্দ হল, আর অপমান হওয়ায় আমরা দুঃখিত হলাম। একটু ভেবে দেখুন যে সম্মানিত হওয়ায় আমরা কী পেলাম এবং অপমানিত হওয়ায় আমাদের কী ক্ষতি হল ? যে বস্তু আসে আবার চলেও যায় তার দ্বারা কোনো লাভ বা ক্ষতি হয় না। অনাদিকাল থেকে অনেক সর্গ-প্রলয়, মহাসর্গ-মহাপ্রলয় হয়েছে, কিন্তু আপনারা স্বয়ং যেমনকার তেমনই থেকে গিয়েছেন—'ভূতগ্রামঃ স এবায়ম্' (গীতা ৮।১৯)। এই রকমই নিত্য বিদ্যমান আপনার কিছু

সম্মান যদি হয় তো তাতে হলটা কী ? অর্থ পেলেন তো তাতে কী হল ? অর্থ চলে গেল তো তাতেই বা কী হল ? শরীর লাভ হলেই বা কী আর শরীর গেলেই বা কী ? রোগ ধরল তাতেই বা কী ? আর রোগ নিরাময় হল তাতেই বা কী ? এগুলি সবই তো আসে-যায়—**'আগমাপায়িনোঽনিত্যাঃ'** (গীতা ২।১৪)। আসা-যাওয়াকারী বস্তুতে হর্ষ-শোক হওয়া খুবই ভুল। এই ভুলকে যদি এখনই দূর করতে না পারেন তো ঠিক আছে, কিন্তু এই কথাটিকে তো বুঝুন। ঠিকভাবে বুঝলে সহজেই ত্যাগ হয়ে যাবে। শিশু প্রস্রাব-পায়খানা করে তাতে হাত দেয়। কেননা সে অবুঝ। কিন্তু বুঝে গেলে কি আর সেগুলি ছোঁবে ? ছুঁলে হাত ধোবে। আপনারা বুঝে নিন যে এইসব মান, সম্মান, সুখ, আরাম, পদ, অধিকার প্রভৃতি সব কিছু মলের চেয়েও নিকৃষ্ট।

প্রাপ্ত বস্তুর দ্বারা কেবল অপরের হিতসাধন করতে হয়। গীতা স্পষ্টই বলেছে—**'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (১২।৪)। সকল প্রাণীর হিতসাধনে যাঁর অনুরাগ সেইরকম মানুষই আমাকে লাভ করেন। লোভীর যেমন অর্থে, ভোগীর যেমন ভোগে অনুরাগ (প্রীতি) থাকে, আকর্ষণ থাকে ; আমাদের অনুরাগ, আমাদের প্রেম, আমাদের আকর্ষণও তেমনই অপরের হিতসাধনে থাকা উচিত। সকল কাজ অপরের কল্যাণের জন্য করা উচিত, নিজের জন্য নয়। কারণ নিজের জন্য কিছু করা বাস্তবিক পক্ষে সিদ্ধ হতে পারে না। প্রকৃতির সম্বন্ধ ছাড়া স্বয়ং-এর মধ্যে কর্তৃত্ব থাকে না।

গভীর নিদ্রায় অহংকারও লুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু আপনারা থাকেন। এই কথাটি আমার খুবই ভালো লাগে যে নিদ্রার আগে আমি ছিলাম, নিদ্রার পরেও আমি রয়েছি এবং নিদ্রার মধ্যে আমার কিছুই মনে ছিল না—এই অনুভূতি তো আমার হয়। কিন্তু নিদ্রার মধ্যে আমি ছিলাম না, এমন অনুভূতি হয় না। ঘুমের মধ্যে আমি ছিলাম না এবং ঘুম ভেঙে গেলে আমার সৃষ্টি হল—এমন কথা আপনারা স্বীকার করেন না। আমি শাস্ত্রের অনেক কথা শুনেছি। কিন্তু আমার মনে নেই যে কোনো গ্রন্থে এমন দৃষ্টান্ত

রয়েছে। গভীর নিদ্রায় শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতির ধারণা ছিল না, একথা আপনারা বলতে পারেন। কিন্তু গভীর নিদ্রায় 'আমি' ছিলাম না, একথা আপনারা বলতে পারেন না। নিজের সত্তাকে অনুভব করবার জন্য এই যুক্তি খুবই জোরালো। গভীর নিদ্রায় আমার কিছু মনে ছিল না, কিন্তু 'কিছুই মনে ছিল না'—এইটি তো মনে ছিল। তার মানে সেই সময়েও আপনি ছিলেন। যে আপনি সদাসর্বদা থাকেন, তাকে যাওয়া-আসা করে যে বস্তু তা কী সন্তোষবিধান করবে ?

যা এসেছে তা চলে যাবেই। যার সঙ্গে সংযোগ হয়েছে, তার সঙ্গে বিচ্ছেদ হবেই। তাতে সুখ বা দুঃখ যদি পান তাহলে নিজের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবেন। এছাড়া আর কিছুই হবার নেই। আমি একটি গল্প শুনেছি। একটি বাড়িতে একজন গুরু এবং তাঁর শিষ্য থাকত। একদিন সেই বাড়ির ভিতর একটা কুকুর ঢুকেছিল। শিষ্যটি বলল, মহারাজ ! ঘরে কুকুর ঢুকেছে। কী করব ? গুরু বললেন, দরজা বন্ধ করে দাও। তাহলে ও এখানে কিছু পাবে না, আর বাইরেও যেতে পারবে না। আমাদের কাছে তো কিছুই নেই, তাহলে সে কী আর খাবে। বাড়ির ভিতর বন্ধ থাকলে অন্যদের বিরক্ত করতে পারবে না। তাই দরজা বন্ধ করে দাও। এইভাবে সংসারের ভিতর ঢুকে গেলেই দরজা বন্ধ হয়ে যায়। তাৎপর্য হল, কুকুর কিছু খেতে ঘরের ভিতর ঢুকেছিল। কিন্তু সেখানে কিছু পেল না, আর ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে বাইরেও যেতে পারল না। ফলে দুদিক থেকেই সে রিক্ত হয়ে গেল। এইভাবেই আপনারা যদি সংসার থেকে কিছু নিতে যান তো সেখানেও কিছু পাবেন না আর পরমাত্মার কাছে থেকেও বিমুখ হয়ে যাবেন। অতএব দুদিক থেকেই রিক্ত থাকবেন। সংসার থেকে আমাদের কিছুই পাবার নেই—এই কথায় আপনারা প্রসন্ন হয়ে যান। এই কথাটিকে কার্যান্বিত করার উপায় হল—'**সর্বভূতহিতে রতাঃ।**' অর্থাৎ প্রাণীমাত্রেরই হিতসাধনে অনুরাগ হওয়া। এতে কী হবে ? আমাদের মধ্যে যে পাওয়ার ইচ্ছা তা দূর হয়ে যাবে। অপরের হিতসাধনের, তাদের সুখ প্রদানের প্রতি ইচ্ছা জন্মাবে। তাহলে

নিজের সুখভোগের যে একাগ্রতা তা দূর হয়ে যাবে। সুখভোগের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে গেলেই পরমাত্মতত্ত্বের প্রাপ্তি হয়ে যাবে। কেননা আপনি যেখানে রয়েছেন পরমাত্মা সেখানে পূর্ণরূপে বিদ্যমান, অংশরূপে (অপূর্ণ) নন। আপনাদেরও (জীবাত্মাকেও) অংশ তখন বলা হয় যখন আপনারা প্রকৃতির অংশ শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত করেন। প্রকৃতির সঙ্গে যদি সম্বন্ধ যুক্ত না করেন তাহলে আপনারা স্বয়ং অংশী হয়ে যাবেন।

সংসার থেকে পাওয়ার কিছু নেই, কেবল সংসারের হিতসাধনই করতে হবে। স্বয়ং-এর জন্য কিছু করতে হবে না। মনের মধ্যে কিছু করার যে রুচি আছে তাকে রুচি মেটাবার কাজেই লাগাতে হবে। আপনারা যদি মান-সম্মান প্রভৃতি নিতেই থাকেন তাহলে এই করার ইচ্ছা কখনো দূর হবে না। নিজেদের পরিবারের সুখের জন্য করুন, কিন্তু তারা আপনাদের সুখ প্রদান করবে এমনটি চাইবেন না। আমি তো পরমাত্মারই অংশ। তাই তাদের (পরিবারের) দেওয়া সুখ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, আমার কাছে পর্যন্ত পৌঁছাতেই পারে না। আমি একজন গৃহস্থাশ্রমের স্ত্রীলোকের কথা শুনেছিলাম। কেউ তাকে বলেছিল যে অমুক লোকেরা তোমাকে দুঃখ দেয়। তাতে সে বলেছিল যে, দুঃখ তার কাছ পর্যন্ত পৌঁছায় না। যতই কষ্ট দাও, নিন্দা করো, অপমান করো সেগুলি আমার কাছে পৌঁছায় না। কষ্ট অপমান শরীরের হবে, নিন্দা নামের হবে, সেগুলি চেতন-তত্ত্ব পর্যন্ত কী করে পৌঁছাতে পারে ? অতএব কিছুই পাওয়ার ইচ্ছা না রেখে কেবল সংসারের জন্য করতে হবে। কেবল সংসারের জন্য করলে আত্মজ্ঞান এসে যাবে, বোধ হয়ে যাবে। পরমাত্মাকে লাভ করতে চাইলে তাও হয়ে যাবে। মুক্তি চাইলে মুক্তি পাবেন, কল্যাণ চাইলে কল্যাণ, চিরস্থায়ী লাভ হয়ে যাবে।

শরীর, বিদ্যা, বুদ্ধি, যোগ্যতা প্রভৃতি যা কিছু আপনারা পেয়েছেন তা সবই সংসার থেকে পেয়েছেন। সংসার থেকে পাওয়া জিনিস নিঃশর্তে সংসারকে ফিরিয়ে দিন। আপনারা পরমাত্মার অংশ। অতএব আপনারা

পরমাত্মার শরণাগত হন। যা উৎপন্ন হয় এবং নষ্ট হয়ে যায় তার আশ্রয় নেবেন না। তুলসীদাস বলেছেন—

এক ভরোসো এক বল এক আস বিস্বাস।
এক রাম ঘন স্যাম হিত চাতক তুলসীদাস।।

(দোঁহাবলী ২৭৭)

সংসার আপনাদের নয়, আপনারা তাকে পাননি, তা আপনাদের কাছে পৌঁছায়নি—এই রকম সংসারের প্রতি আশা, বিশ্বাস, ভরসা রাখাই হল জীবের জড়তা, মূর্খতা—

ইহ বিনতী রঘুবীর গুসাঈ।
ঔর আস-বিস্বাস-ভরোসা, হরৌ জীব-জড়তাঈ।।

(বিনয়পত্রিকা ১০৩)

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলে জড়তা দূর হয়, আবার কেবল অপরের হিতসাধনের জন্য কর্ম করলেও জড়তা দূর হয়। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, যোগ্যতা প্রভৃতি সব কিছুই সংসারের জন্য, নিজেদের জন্য কিছুই নয়। যা সৃষ্ট হয় এবং নষ্ট হয়ে যায় তা অনুৎপন্ন তত্ত্বের কোন্ কাজে আসবে ? বিনাশী বস্তু তো বিনাশী সংসারের হিতের জন্য, সুখের জন্য, আরামের জন্য ব্যয় করার উদ্দেশ্যে পাওয়া গিয়েছে। তাকে যদি আপনারা নিজেদের জন্য মনে করেন তাহলে আপনারা অবশ্যই জড়িয়ে পড়বেন। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মান-সম্মান পেলে আপনারা প্রসন্ন হলেন—এ কত বড় ভুল। তার কারণ যা পেয়েছেন তা থাকবে না, তার সঙ্গে বিচ্ছেদ হবেই। শরীরকে নিজের বলে মনে করেছেন, এবার অনেক রকম সমস্যা আসবে। কেননা গোড়ায় ভুল হয়ে গিয়েছে। যোগ করবার সময় প্রথম লাইনে যদি ভুল হয় আর পরের লাইনগুলিতে খুব সাবধানে যোগ দেওয়া হয় তাহলে সেই যোগফল কি ঠিক হবে ? প্রথমেই যদি ভুল হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত ভুল হবেই। একটি গল্প মনে পড়ে যাচ্ছে। একজন লোককে ঘোড়ায় চড়ানো হয়েছে আর বলা হয়েছে যে কোথাও যাওয়ার আগে এই ঘোড়াটি তিন বার লাফাবে, অতএব সাবধানে

থেকো। সে বলল যে আমি তো প্রথমবারে লাফাবার সময়েই লাফিয়ে নেমে পড়বো, তাহলে পরবর্তী দুবারের ধাক্কা থেকে বেঁচে যাব। তাই যদি প্রথমেই ভুল হয় তাহলে কেবল ভুলই হতে থাকবে। তাই প্রথমেই ভুল করবেন না। শরীরকে নিজের মনে করবেন না। তার দ্বারা সকলের সেবা করুন, সকলের হিতসাধন করুন।

কল্যাণের সহজ সাধনা—কর্মযোগ

মানুষের মধ্যে কর্ম করার একটি স্বাভাবিক রুচি থাকে। তার কারণ সে কিছু না কিছু পেতে চায়। তাই কিছু না কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যেই সে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আসক্তিপূর্বক কর্মে নিযুক্ত থাকে। কিছু পাওয়ার আশার কারণে কর্মে তার আসক্তি এত বেশি হয় যে বৃদ্ধাবস্থায় যখন তার ইন্দ্রিয়গুলি কর্ম সাধনে অসমর্থ হয়ে যায় তখনও সে কর্ম থেকে অসঙ্গ হতে পারে না। এইভাবে আসক্তিপূর্বক কর্ম করতে করতে তার মৃত্যু হয়। এই রকম পরিস্থিতিতে হঠতাপূর্বক কর্ম ত্যাগ করার পরিবর্তে এমন কোনো একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে যার অন্তর্গত শাস্ত্রবিহিত কর্ম সম্পাদন করতে থাকলেও কর্মাসক্তি দূর হয়ে যায় এবং মানুষ কল্যাণ প্রাপ্ত হয়। এই দৃষ্টিতে মানুষের পক্ষে কর্মযোগই একটি সফল ও সহজ উপায়। কর্মযোগ এমন— যেমন খাদ্যের মধ্যে ঔষধ মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান বলেছেন—

> যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিধিৎসয়া।
> জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥
> নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্মসু।
> তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগস্তু কামিনাম্॥
> যদৃচ্ছয়া মৎ কথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
> ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥
>
> (১১।২০।৬-৮)

অর্থাৎ নিজেদের কল্যাণকামী মানুষদের জন্য আমি তিনটি যোগ (পথ) জানিয়েছি—জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ এবং ভক্তিযোগ। এই তিনটি ছাড়া কল্যাণের অন্য কোনো পথ নেই। যাঁরা খুবই বিরাগী তাঁরা

জ্ঞানযোগের অধিকারী, যাঁরা সংসারে আসক্ত তাঁরা কর্মযোগের অধিকারী এবং যাঁরা খুব বেশি বিরক্ত নন আবার আসক্তও নন তাঁরা ভক্তিযোগের অধিকারী।

উপরোক্ত ভগবৎবচন অনুসারে পৃথিবীতে কর্মযোগের অধিকারীদের সংখ্যাই অধিকতম হয়।

এখানে এই শঙ্কা উদিত হয় যে সংসারে আসক্ত মানুষ কর্মযোগের পথে (পরমাত্মার দিকে) কী করে যেতে পারবে ? এর উত্তর ভগবান **'নৃণাং শ্রেয়ো বিধিৎসয়া'** পদের দ্বারা দিয়েছেন। তাৎপর্য হল এই যে সাংসারিক ভোগ এবং সেগুলি সংগ্রহে রুচি থাকা সত্ত্বেও যে মানুষ সেই ভোগ্যসামগ্রী থেকে নিজের রুচিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নিজের কল্যাণ করতে চায় সে কর্মযোগের পালন করে সহজেই নিজের কল্যাণ করতে পারে। নিজের কল্যাণ করার বিচার তার যতটা দৃঢ় হবে তার ততই তাড়াতাড়ি কল্যাণ হবে।

কর্মযোগের তাৎপর্য হল—কর্ম করতে করতে পরমাত্মাকে লাভ করা। কর্মযোগে দুটি শব্দ—কর্ম এবং যোগ। শাস্ত্রবিহিত কর্তব্যকর্মকে 'কর্ম' বলা হয়। কর্ম সংসার (ফলপ্রাপ্তি)-এর জন্যও করা হয় আবার সংসার থেকে উপরে উঠে পরমাত্মাকে পাওয়ার জন্যও করা হয়। ভগবান 'যোগ'-এর ব্যাখ্যা দুভাবে করেছেন—(১) সমতাকে যোগ বলা হয়—**'সমত্বং যোগ উচ্চতে'** (গীতা ২।৪৮) এবং (২) দুঃখ সংযোগের বিচ্ছেদকে যোগ বলা হয়—**'তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসজ্ঞিতম্'** (গীতা ৬।২৩)। পরমাত্মা হলেন 'সম'—**'নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম'** (গীতা ৫।১৯)। অতএব সমতার দ্বারা পরমাত্মায় স্থিতি হয়, একে 'যোগ' বলা হয়। সংসারের সম্বন্ধই হল দুঃখসংযোগ। অতএব সংসার থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে গেলে 'যোগ' (সমতা বা পরমাত্মা) প্রাপ্তি হয়ে যায়[১]। কর্মযোগে যোগের গুরুত্ব, 'কর্ম'-এর নয়। এইজন্য

---

[১]পাতঞ্জল যোগদর্শন সমাধিকে 'যোগ' বলে মনে করেন। কিন্তু গীতা পরমাত্মার নিত্য সিদ্ধ সম্বন্ধকেই 'যোগ' বলে মনে করে। পাতঞ্জল যোগদর্শনের 'যোগ' শব্দ 'যুজ সমাধৌ' ধাতুর দ্বারা এবং গীতোক্ত 'যোগ' শব্দ 'যুজির যোগে'

ভগবান বলেছেন কর্মে যোগই হল কুশলতা **'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'** (গীতা ২।৫০)।

'কর্ম'-এর সম্বন্ধ সংসার (জড়)-এর সঙ্গে আর 'যোগ'-এর সম্বন্ধ স্বয়ং (চেতন)-এর সঙ্গে। অতএব 'কর্ম' সংসারের জন্য আর 'যোগ' নিজের জন্য করা হয়। কর্মযোগে কর্ম, কর্মসামগ্রী এবং কর্মফলে মমতা, কামনা এবং আসক্তি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা প্রয়োজন। কামনা এবং আসক্তি ত্যাগ করে কেবল সংসারের মঙ্গলের জন্য কর্ম করলে সংসারের সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে গিয়ে পরমাত্মাকে লাভ করা যায়। তাই ভগবান বলেছেন যে যজ্ঞার্থ কর্ম (কেবল অন্যের হিত সাধনে কর্ম)-এর অতিরিক্ত অন্য (নিজের জন্য করা) সকল কর্ম বন্ধনকারী—

'যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।' (গীতা ৩।৯)

কর্মের বন্ধন 'পর' থেকে হয়, 'স্ব' থেকে হয় না। নিজের জন্য কর্ম করলে মানুষ বন্ধনদশা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তার সম্বন্ধ সংসারের সঙ্গে হয়ে যায়। কেননা স্বরূপত মানুষের মধ্যে কোনো ক্রিয়া হয় না। সমস্ত ক্রিয়া হয় প্রকৃতিতে।[১] প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় মানুষ প্রকৃতির

ধাতুর দ্বারা নিষ্পন্ন হয়েছে।

পরমাত্মার সঙ্গে মানুষের নিত্য সম্বন্ধ, কিন্তু সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ মেনে নেওয়ার ফলে মানুষ সেই নিত্য সম্বন্ধকে ভুলে গিয়েছে—তার প্রতি বিমুখ হয়ে গিয়েছে। অতএব সংসারের সঙ্গে 'জ্ঞান'পূর্বক সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করলে জ্ঞানযোগ, 'কর্ম'-এর দ্বারা করলে কর্মযোগ এবং 'ভক্তি'-র দ্বারা করলে ভক্তিযোগ হয়। এই প্রকারে সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদপূর্বক পরমাত্মার সঙ্গে নিত্যসম্বন্ধ অর্থাৎ 'নিত্যযোগ'-কে (যা অনাদি কাল থেকে নিত্যসিদ্ধ রয়েছে) প্রাপ্ত করার নাম 'যোগ'।

[১]প্রকৃতি কোনো অবস্থাতেই অক্রিয় থাকে না। মহাপ্রলয়ের অবস্থাতেও প্রকৃতি নিরন্তর ক্রিয়াশীল থাকে। তারই জন্য মহাপ্রলয়ের সমাপ্তির পর সৃষ্টির আরম্ভ হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে নিদ্রা, সমাধি প্রভৃতি অবস্থাতেও প্রকৃতির ক্রিয়াগুলি সূক্ষ্মরূপে নিরন্তর হতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোনো নিদ্রারত মানুষকে সময়ের আগেই জাগিয়ে

ক্রিয়াগুলিকে নিজের উপর আরোপিত করে।[১]

বাস্তবে কোনো মানুষ কোনো অবস্থাতেই (জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্ছা এবং সমাধি পর্যন্ত) এক মুহূর্তও কর্ম না করে থাকতে পারে না। তার কারণ প্রকৃতিজনিত গুণাবলীর বশে থাকায় সকল মানুষকেই কর্ম করতে বাধ্য থাকতে হয়।[২] এইজন্যই মানুষদের মধ্যে স্বভাবতই কর্ম করার একটি তীব্রতা বিদ্যমান। হঠতাপূর্বক কর্মকে স্বরূপত ত্যাগ করলে অথবা নিজের জন্য কর্ম করলে এই তীব্রতা শান্ত হয় না। নিষ্কামভাবে অপরের হিতের জন্য কাজ করলেই ওই তীব্রতা শান্ত হতে পারে। এইজন্য বলা হয়েছে, **'আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে'** (গীতা ৬।৩) অর্থাৎ যিনি যোগে (সমতায়) আরূঢ় হতে চান সেই রকম মননশীল যোগীর পক্ষে কর্তব্যকর্ম করা হল কারণ। এই দৃষ্টিতে পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য কর্মযোগের অনুষ্ঠান করা সকলের জন্য প্রয়োজন এবং তা সুগম।

মনুষ্যশরীর হল কর্মযোনি। কর্ম মনুষ্যশরীরে করা যায় এবং তার ফলে অন্য যোনিতে ভোগ্য হয়। তাই মনুষ্য শরীরে বুদ্ধির প্রাধান্য। নিজের কল্যাণ করা এবং অন্যকে সুখ প্রদান করা, তাদের সেবা করা হল বুদ্ধির সদ্ব্যবহার। সুখভোগ এবং সংগ্রহ করা তথা অনুকূলতা প্রাপ্তিতে সুখী হওয়া আর প্রতিকূলতা প্রাপ্তিতে দুঃখিত হওয়া হল বুদ্ধির দুরুপযোগ। মনুষ্য শরীর একমাত্র কর্তব্য পালনের জন্যই প্রাপ্ত হয়েছে। সুখভোগ করা এবং অনুকূলতা-প্রতিকূলতা প্রাপ্তিতে সুখী-দুঃখী হওয়া তো পশু-পক্ষী

দিলে 'আমার কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে'—এমন কথা বলতে শোনা যায়। এতেই বোঝা যায় যে ঘুমন্ত অবস্থাতেও সূক্ষ্মরূপে ঘুমের পাকা হবার ক্রিয়া চলছিল। যখন ঘুম পুরো হয়ে যাওয়ার পর মানুষ জাগে তখন সে একথা বলে না। কেননা তখন ঘুম পেকে যাওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।

[১]প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ (গীতা ৩।২৭)

[২]ন হি কশ্চিৎক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্ব প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ (গীতা ৩।৫)

প্রভৃতি নিম্ন যোনিতেও হয়ে থাকে। তাদের কাছে কর্তব্য পালনের কোনো প্রশ্নই নেই। যে কাজের দ্বারা কেবল সংসারেরই কল্যাণ হয় সেইরকম কর্ম করা হল কর্মযোগ।

কর্মযোগের বৈশিষ্ট্য এমনই যে সাধক যে কোনো (জ্ঞানযোগ অথবা ভক্তিযোগ) পথেই চলুন না কেন, কর্মযোগের প্রণালী (নিজের জন্য কিছু না করা) তাঁকে অনুসরণ করতেই হবে, কেননা সকলের মধ্যেই ক্রিয়াশক্তি নিরন্তর থাকে। তাই ভগবান জ্ঞানযোগীর জন্য **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** (গীতা ৫।২৫, ১২।৪) তথা ভক্তিযোগীর জন্য **'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ'** (গীতা ১২।১৩) বলে উভয়ের জন্য অপরের হিতসাধনে কর্ম করা অনিবার্য জানিয়েছেন।[১]

কর্মযোগে কর্তা নিষ্কাম থাকেন, কর্ম নয় ; কেননা জড় হওয়ার কারণে কর্ম স্বয়ং নিষ্কাম বা সকাম হতে পারে না। নিষ্কাম কর্তার দ্বারাই নিষ্কাম কর্ম হয়ে থাকে, একেই কর্মযোগ বলে। তাই কর্মযোগই বলা হোক অথবা নিষ্কাম কর্ম, দুটিরই অর্থ এক। সকাম কর্মযোগ হয় না। এইজন্য কর্তার ভাব সদাসর্বদা নিষ্কাম থাকা উচিত।[২]

কর্মযোগী কারো অহিত সহ্য করতে পারেন না। কেননা যেমন সমগ্র শরীরের সঙ্গে শরীরের প্রতিটি অঙ্গের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকে তেমনই সমগ্র শরীরের সঙ্গেও সংসারের প্রতিটি শরীরের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকে। মানুষ যেমন তার শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গের সুখ-দুঃখে সুখী এবং দুঃখিত হয় তেমনই কর্মযোগী প্রাণীমাত্রেরই সুখ এবং দুঃখকে

---

[১]সকল প্রাণীর হিতসাধনের প্রতি জ্ঞানযোগীর প্রীতি হওয়ার কারণে এবং ভক্তিযোগীর সকলের প্রতি মৈত্রী ও করুণার ভাব হওয়ার কারণে তাঁদের দ্বারা স্বতই কেবল পরহিতার্থে কর্ম সম্পাদিত হয়ে থাকে, যা কর্মযোগের মূল কথা।

[২]নিষ্কামভাবে কর্ম করাকেই কর্মযোগ বলা হয়। কর্মযোগ তখনই হয় যখন কর্ম নিষ্কামভাবে করা হয়। অতএব 'নিষ্কাম কর্মযোগ' বললে পুনরুক্তি দোষ হয়। তাছাড়া 'নিষ্কাম কর্মযোগ' বললে 'সকাম কর্মযোগ'—এই প্রশ্নও উত্থিত হয়, যা কখনোই সম্ভব নয়। কেননা কর্মযোগ সর্বদাই নিষ্কাম হয়ে থাকে, সকাম নয়।

নিজের সুখ-দুঃখ বলে অনুভব করেন। দাঁতের দ্বারা জিভ কেটে গেলে নিজের দাঁত ভেঙে ফেলার ইচ্ছা কারো হয় না। তেমনই যেটিকে নিজের শরীর বলা হয় তার অনিষ্ট সাধনকারীর প্রতি অহিত করার ইচ্ছা কর্মযোগীর কখনো হয় না।

মানুষের কাছে (শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, সামর্থ্য, সময়, যোগ্যতা, বিদ্যা, ধন, জমি ইত্যাদি) যত কিছু সামগ্রী আছে যেগুলি সবই সে সংসার থেকে পেয়ে থাকে, এগুলি তার ব্যক্তিগত নয়। এটি প্রত্যক্ষ যে এই প্রাপ্ত বস্তুগুলির উপর আমাদের কোনো অধিকার চলে না। এই বস্তুগুলিকে আমার ইচ্ছামতো ধরে রাখতে পারি না, বা মনের মতন পরিবর্তনও করতে পারি না। আমরা এগুলি সঙ্গে করে আনিনি, সঙ্গে করে নিয়েও যাব না। বাস্তবে এগুলির সদ্ব্যবহার (পরার্থে) করার জন্যই আমরা পেয়েছি, নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। প্রাপ্ত বস্তুকে অপরের সেবায় না লাগিয়ে যারা সেগুলিকে কেবল নিজের ভোগে লাগায় ভগবান তাদের চোর বলেছেন—**'তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ'** (গীতা ৩।১২)। শুধু তাই নয় ভগবান এমন মানুষকে পাপায়ু বলে তাদের বেঁচে থাকাকেই ব্যর্থ বলেছেন—**'অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি'** (গীতা ৩।১৬)।

সংসার থেকে প্রাপ্ত শরীরের দ্বারা অদ্যাবধি আমরা কেবল নিজেদের জন্যই কর্ম করেছি। নিজেদের সুখভোগ ও সংগ্রহের দৃষ্টিতে ওই শরীরের ব্যবহার করেছি। তাই সংসারের কাছে আমরা ঋণী। এই ঋণ শোধ করবার জন্য আমাদের কেবল সংসারের হিতের জন্য কাজ করতে হবে। ফলের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কাজ করলে পুরাতন ঋণ তো শোধ হয়ই না, আরও নতুন ঋণ হয়ে যায়। ঋণমুক্ত হওয়ার জন্য নতুন জন্ম নিতে হয়।[১] অপরের হিতের জন্য কর্ম করলে পুরাতন ঋণ শোধ হয়ে যায় আর নিষ্কামভাবে কর্ম করলে নতুন ঋণ হয় না। এই দৃষ্টিতে (জন্ম-মৃত্যু থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য) কর্মযোগের পালন করা সকলের জন্য আবশ্যক।

---

[১]গতাগতং কামকামা লভন্তে। (গীতা ৯।২১)

কর্মযোগের বিষয়ে ভগবান বলেছেন—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥

(গীতা ২।৪৭)

তাৎপর্য হল এই যে মানুষের কেবল কর্ম করার অধিকার আছে। পুরাতন কর্মের ফলস্বরূপ যে সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে এবং নতুন (এখন করা হচ্ছে) কর্মের ফলস্বরূপ ভবিষ্যতে যেসব সামগ্রী পাওয়া যাবে তার উপর মানুষের কোনো অধিকার নেই। তাই ফলের হেতু হওয়া মানুষের উচিত নয় এবং কর্ম না করার প্রতিও তার আসক্তি থাকা উচিত নয়। সকল কর্মই অনিত্য অর্থাৎ তার আরম্ভ আছে এবং শেষ আছে। তাহলে সেই কর্ম থেকে প্রাপ্ত ফল নিত্য কী করে হতে পারে ? এই দৃষ্টিতে কর্মযোগী কর্ম এবং কর্মফল দুটির সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ যুক্ত করেন না।

কোনো বস্তুই আমাদের নিজস্ব নয় এবং আমাদের জন্যও নয়। এই সব জিনিস সংসারের এবং সংসারের জন্যই। মানুষ ভুল করে ওই সব জিনিসকে নিজেদের এবং নিজের জন্য মনে করে বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং ফলের আকাঙ্ক্ষা করে ভবিষ্যতে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রস্তুতি করে নেয়।[১]

কর্মযোগীর প্রবৃত্তি প্রথম থেকেই অপরের সেবা করা হয়ে থাকে। তাই ভোগ এবং সংগ্রহের আসক্তি তাঁর স্বতই দূর হয়ে যায়। কর্মযোগে ব্যক্তিগত সুখ সম্পূর্ণরূপে চলে যায়। এইজন্য ভগবান কর্মযোগকে ত্যাগ নাম দিয়েছেন (গীতা ১৮।৫-৬)।

মানুষ যা কিছু সামগ্রী, যোগ্যতা, সামর্থ্য, পরিস্থিতি প্রভৃতি পেয়ে থাকে সেগুলির সদ্ব্যবহার সে কর্মযোগের অনুষ্ঠানের দ্বারাই করতে পারে। কর্মযোগে অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রত্যাশা নেই। কেননা যে বস্তু আমাদের

---

[১]কর্মফলের সম্বন্ধ ভবিষ্যতের সঙ্গে হয়ে থাকে। অতএব ফলের আকাঙ্ক্ষা করলে তা ভাবী জন্মের কারণ হয়ে যায়। এই অবস্থায় মুক্তি কী করে হতে পারে ?

কাছে নেই সংসার তার আশা করে না। কর্মযোগের বৈশিষ্ট্য হল এই যে আমরা যে বস্তু, পরিস্থিতি প্রভৃতি প্রাপ্ত করেছি কেবল সেগুলির সদ্ব্যবহার করেই আমরা কর্মযোগ পুরোপুরি পালন করতে পারি। ভগবান গীতায় বলেছেন যে নিজের নিজের (প্রাপ্ত) কর্তব্য ঠিকভাবে আচরণ করলেই মানুষ পরমসিদ্ধি লাভ করতে পারে—**'স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ'** (১৮।৪৫)। অতএব মানুষ যে কোনো দেশ, কাল, পরিস্থিতি প্রভৃতিতে থাকুক না কেন সে স্বার্থ, অহংকার, কামনা, মমতা প্রভৃতি ত্যাগ করে সকলের হিতের জন্যই যেন সব কর্ম করে।

কর্মযোগের পথে স্থূল শরীরের-দ্বারা কৃত সেবা, সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা-কৃত চিন্তন, ধ্যান প্রভৃতি এবং শরীরের দ্বারা-কৃত সমাধি পর্যন্ত সকল কর্ম কেবল সংসারের কল্যাণের জন্যই করা হয়ে থাকে, নিজের জন্য নয়। কারণ অপরের হিতসাধনে কর্ম করলে নিজের স্বার্থ দূর হয়।

যদিও নিজের কল্যাণ চাওয়াও শ্রেয় তবু সংসারের কল্যাণ চাওয়া তার চেয়ে অনেকগুণ ভালো। নিজের কল্যাণকে সংসারের কল্যাণ থেকে ভিন্ন মনে করাই ভুল। বাস্তবে সংসারের কল্যাণ চাওয়ার মধ্যেই নিজের কল্যাণও স্বাভাবিকভাবে নিহিত থাকে। স্থূল সংসারের সঙ্গে স্থূল শরীরের, সূক্ষ্ম সংসারের সঙ্গে সূক্ষ্ম শরীরের এবং কারণ সংসারের সঙ্গে কারণ শরীরের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। মানুষ নিজের শরীরের জন্য যা কিছুই করুক না কেন তা সবই সংসারের দ্বারা প্রদত্ত শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতির সাহায্যেই করে। অতএব সংসারের সামগ্রীর দ্বারা কর্ম করা আর কেবল নিজের জন্য কল্যাণ চাওয়া ন্যায়সঙ্গত নয়।

কর্ম এবং ক্রিয়ার মধ্যে অনেক প্রভেদ। কর্মে কর্তৃত্বাভিমান থাকে, তাই তার ফল হয়। ক্রিয়াতে কর্তৃত্বাভিমান থাকে না, তাই তার ফলও হয় না। যেমন শৈশব থেকে যুবাবস্থায় যাওয়া, গৃহীত খাদ্য হজম হওয়া প্রভৃতি হল 'ক্রিয়া'। এর কোনো ফল (বন্ধন) হয় না। কর্মযোগী কর্ম করতে থাকলেও (কামনা, মমতা, আসক্তি না থাকায়) স্বাভাবিকভাবে কর্ম থেকে নির্লিপ্ত থাকেন। এইজন্য তাঁর দ্বারা ক্রিয়া হয়, কর্ম হয় না।

তাই তাঁর অন্তরে অনুকূলতা-প্রতিকূলতার দরুণ হর্ষ-শোকাদি বিকার উৎপন্ন হয় না। যদি তাঁর উপর অনুকূলতা-প্রতিকূলতার প্রভাব পড়ে তাহলে তিনি কর্মযোগী নন, তিনি কর্মী। সংসার থেকে কোনো কিছু পাবার আশা যিনি করেন সেই রকম মানুষ ভালোভাবে কর্মযোগের অনুষ্ঠান করতে পারেন না।

যদিও কর্মযোগীর সংসারের কোনো প্রয়োজন থাকে না তথাপি সংসারের কাছে কর্মযোগীর খুবই প্রয়োজন। কেননা কর্মযোগ অনুসারে কাজ করে মানুষ সংসারের কাছে খুবই উপযোগী হয়ে যায়। এর বিপরীতে নিজের স্বার্থের জন্য কাজ করে যে মানুষ সে বাস্তবে না সংসারের উপযোগী হয়, না হয় নিজের।

আজকাল মানুষের মধ্যে এই একটি কথা প্রচলিত যে এই সারা সংসার মানুষের সুখ-ভোগের জন্যই সৃষ্ট হয়েছে—অতএব এগুলি ভোগ করাই উচিত। এটি সম্পূর্ণ ভুল কথা। বাস্তবে মানুষ সংসারের জন্য, সংসার মানুষের জন্য নয়। চুরাশি লক্ষ যোনিতে যত জীব আছে তারা সবাই কর্মফল ভোগ করবার জন্যই যেন জেলখানায় বন্দি হয়ে আছে। বন্দিদের দেখাশোনা এবং মঙ্গলের জন্য যেমন অফিসার থাকে তেমনই মানুষও সংসারের দেখাশোনা ও ভালো করার জন্য রয়েছে। জলসত্রে বসে থাকা মানুষ যদি মনে করে যে জল কেবল তারই জন্য অথবা অন্ন বিতরণকারী যদি মনে করে যে অন্ন কেবল তারই জন্য তাহলে তা কত বড় মূর্খতা হবে! তেমনই সংসারকে, সুখভোগকে নিজের এবং নিজের জন্য মনে করা খুবই ভুল। মনুষ্যজীবনে এই ভুলের কোনো স্থান নেই।

মানুষের মধ্যে এমন সংশয়ও কাজ করে যে ভজন-পূজন করা, অপরের সেবা করা, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করা প্রভৃতির কামনাও তো 'কামনা'। তাহলে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাম কী করে হওয়া যাবে ? এর উত্তর হল এই যে স্বরূপকে জানার কামনা, সেবা করার কামনা, ভগবানকে প্রাপ্ত করার কামনা 'কামনা' নয়। বস্তুত বিনাশশীল (অ-সৎ)-এর কামনাই হল কামনা, কেননা সেগুলি নিজের নয়। অবিনাশী—(সৎ)-

এর কামনা 'কামনা' নয়, কেননা সেগুলি নিজস্ব। সংসার থেকে প্রাপ্ত বস্তু সংসারের সেবায় লাগিয়ে দেবার কামনা 'কামনা' নয়, বরং তা হল ত্যাগ। কেননা বিনাশশীল (অ-সৎ) হওয়ার কারণে সংসারও নিজের নয় এবং সংসার থেকে প্রাপ্ত বস্তুও নিজের নয়।

লোকেরা প্রায়ই বলে থাকে যে আমরা যদি কোনো প্রকারের কামনা না করি তাহলে ধনাদি কোনো বস্তু প্রাপ্ত করা যাবে না। তাহলে কামনা ব্যতিরেকে আমাদের জীবন নির্বাহ কী করে হবে ? এই কথাটিও একেবারেই নিরাধার। বাস্তবে কোনো অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি 'কামনা'-র কারণ নয়, বরং তা প্রাপ্ত বস্তুর সদ্ব্যবহারের কারণে অর্থাৎ কর্তব্য পালনের ফলে হয়ে থাকে। পূর্বের সদ্ব্যবহারের ফলে বর্তমানে এবং বর্তমানের সদ্ব্যবহারের কারণে ভবিষ্যতে অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি অবলম্বিত। সদ্ব্যবহারের তাৎপর্য হল—বর্তমানে প্রাপ্ত সামগ্রীর দ্বারা কর্তব্যকর্মের আচরণ। যদি এই সদ্ব্যবহার নিষ্কামভাবে করা যায় তাহলে পরমাত্মার প্রাপ্তি হবে আর সকামভাবে করলে সাংসারিক বস্তুগুলির প্রাপ্তি হতে পারে।

অর্থাদি সকল বস্তু কর্ম করলেই প্রাপ্ত হয়। যে বস্তু কর্মের অধীন তাকে কামনা করলে কী করে পাওয়া যেতে পারে ? অতএব তার জন্য কামনা করা নিরর্থক। এর অতিরিক্ত কামনা পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর আমরা সেই অবস্থাতেই এসে যাই যেখানে আমরা কামনা সৃষ্টির আগে ছিলাম। কামনা সব সময় পূর্ণ হয় না এবং কামনার অনুরূপ প্রাপ্ত বস্তুও সব সময় থাকে না। অতএব কামনা করলে পরাধীনতা ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না।

বাস্তবে সাংসারিক বস্তুগুলিকে কামনা করার পর যখন সেগুলি আমরা পেয়ে যাই তখন সেগুলির প্রাপ্তিতে আমাদের সুখ প্রতীত হয়। সেই সুখ ওই বস্তুগুলির প্রাপ্তিতে হয়নি। যদি তা হত তাহলে সেগুলি থাকতে কখনো কোনো দুঃখ হত না। অন্তত যে বস্তু কামনার পর সুখ পাওয়া গিয়েছে সে বস্তুকে নিয়ে তো কোনো দুঃখ হওয়ার কথা নয়, কিন্তু

তাহলেও দুঃখ হয়। এতেই প্রমাণিত হয় যে বস্তু প্রাপ্তির পরে যে সুখ তা বস্তুর প্রাপ্তিজনিত নয়। তা হল কামনা নিবৃত্তির সুখ।

যেমন, আমরা অর্থ কামনা করি। তখন আমাদের মনের সঙ্গে অর্থের একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সাধিত হয়। অর্থাৎ আমাদের মনের দ্বারা অর্থ ধরা পড়ে। যখন বাইরে থেকে অর্থ পাওয়া যায় তখন মনের দ্বারা বাঁধা পড়া অর্থের চিন্তা দূর হয়ে যায় এবং সুখ প্রতীত হয়। বাস্তবে ওই সুখ বাইরে থেকে প্রাপ্ত অর্থের জন্য হয়নি। প্রত্যুত মনের দ্বারা বাঁধা পড়া অর্থের চিন্তা পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ায় অর্থাৎ অর্থের কামনা দূর হয়ে যাওয়ায় তা হয়েছে। কিন্তু মানুষ ভুল করে এই সুখকে বস্তু প্রাপ্তিজনিত মনে করে আবার নতুন নতুন কামনা করতে থাকে। এই কারণে ওই কামনা নিবৃত্তিকে অর্থাৎ নিষ্কামভাবকে সুরক্ষিত রাখতে পারে না। এইজন্যই বলা হয়েছে—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৯।১৯।১৪, মনুস্মৃতি ২।৯৪)

'বিষয়ভোগের দ্বারা কামনা কখনো শান্ত হয় না, বরং ঘৃতাহুতির মতো তা ক্রমশই বাড়তে থাকে।'

মানুষ যদি এই চিন্তা করে যে বাস্তবে সুখ কামনা-নিবৃত্তিতেই হয়, তাহলে তার জীবনে কামনার কোনো স্থান থাকতে পারে না। কামনা নিবৃত্তি (নিষ্কামভাব) যুক্ত সকল মানুষই স্বাধীন, কেননা এতে অন্য কারো সহায়তার প্রত্যাশা নেই।

সম্পূর্ণরূপে সাংসারিক কামনার পূরণ করার সামর্থ্য কারো নেই, কিন্তু কামনাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করার সাধ্য সকল মানুষের আছে।[১] কামনাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করলেই সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে পরমাত্মার প্রাপ্তি স্বতই হয়ে যায়, যা নিত্য প্রাপ্ত।

---

[১]প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্। (গীতা ২।৫৫)

কামনাযুক্ত প্রত্যেক প্রবৃত্তি বা কর্ম হল বন্ধনকারী। কামনার বিনাশ ছাড়া শান্তি লাভ একেবারেই অসম্ভব।[১] কামনা করলে তো লাভ কিছুই হয় না, কিন্তু অশেষ ক্ষতি হয়। প্রাপ্ত বস্তু (শরীরাদি)-কে নিজস্ব মনে করলে (মমতার ফলে) কামনা উৎপন্ন হয়। বাস্তবে মনুষ্যজীবনে কামনার কোনো স্থান নেই। কামনারহিত হয়ে অপরের জন্য কর্ম করাতেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা। সেজন্য গীতায় ভগবান সকল মানুষকে নিষ্কামভাবে পরহিতার্থে কর্ম করার আদেশ দিয়েছেন—

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥

(২।৪৮)

'হে ধনঞ্জয় ! তুমি আসক্তি ত্যাগ করে সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমান-বুদ্ধি ধারণ করে যোগে স্থিত হয়ে কর্তব্যকর্ম করো। সমত্বকেই যোগ বলা হয়।'

---

[১]স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী। (গীতা ২।৭০)
'যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্' (গীতা ৫।১২)

ভগবান বিবস্বানকে উপদিষ্ট কর্মযোগ

কর্মযোগে দুটি শব্দ আছে—কর্ম এবং যোগ। কর্মের অর্থ হল করা আর যোগের অর্থ সমতা—'**সমত্বং যোগ উচ্চতে**' (গীতা ২।৪৮) অর্থাৎ সমতাপূর্বক নিষ্কামভাবে শাস্ত্রবিহিত কর্মের আচরণকে কর্মযোগ বলা হয়। কর্মযোগে নিষিদ্ধ কর্মের সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ এবং ফল ও আসক্তি ত্যাগ করে বিহিত কর্মের আচরণ করা উচিত।

ভগবান বলেছেন—

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥

(গীতা ২।৪৭)

'তোমার কেবল কর্ম করার অধিকার, তার ফলে কখনো নয়। তাই তুমি কর্মফলের হেতু হয়ো না এবং তোমার মধ্যে কর্ম ত্যাগের আসক্তিও যেন না থাকে।'

মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, শরীর, পদার্থ, ধন-সম্পত্তি প্রভৃতি যা কিছু আমাদের কাছে আছে, সেগুলি সবই আমরা সংসারের কাছ থেকে পেয়েছি। তাই সেগুলি 'নিজের' এবং 'নিজের জন্য' না হয়ে সংসারের জন্য রয়েছে—এইরকম মনে করে নিঃস্বার্থভাবে অপরের হিত সাধন করা, তাদের সুখ প্রদান করাকে (সংসারের সামগ্রী সংসারের সেবাতেই লাগানোকে) কর্মযোগ বলা হয়—

পর হিত সরিস ধর্ম নহিঁ ভাঈ। পর পীড়া সম নহিঁ অধমাঈ॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৭।৪১।১)

পরহিত বস জিন্হ কে মন মাহীঁ। তিন্হ কহুঁ জগ দুর্লভ কছু নাহীঁ॥

(শ্রীরামচরিতমানস ৩।৩১।৫)

কোনো মানুষই মুহূর্তের জন্যও কর্ম না করে থাকতে পারে না,

কেননা প্রকৃতি নিরন্তর কর্মশীল। সেজন্য প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষাকারী কোনো প্রাণীই ক্রিয়ারহিত কী করে থাকতে পারে ? (গীতা ৩।৫) যদিও পশু-পাখি তথা বৃক্ষাদি যোনিতেও স্বাভাবিক ক্রিয়া হতে থাকে তবু ফল এবং আসক্তি ত্যাগ করে কর্তব্যবুদ্ধিতে কর্ম করার ক্ষমতা তাদের মধ্যে নেই, কেবল মনুষ্য যোনিতেই এমন জ্ঞান সুলভ। বস্তুত মনুষ্য শরীরের নির্মাণই হয়েছে কর্মযোগের আচরণের জন্য এবং এর কাছে সমস্ত বস্তু কেবল কর্ম করার জন্যই আছে। যেমন, সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাদের উপদেশ দিতে গিয়ে ভগবান ব্রহ্মার ভাষায় বলেছেন—

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্।[১] (গীতা ৩।১০)

'তোমরা যজ্ঞের (কর্তব্যকর্মের) দ্বারা উন্নতি লাভ করো। এটি (কর্তব্য-কর্ম) তোমাদের কর্তব্যকর্ম করার সামগ্রী প্রদানকারী হোক।' মানুষের উচিত প্রত্যেক কর্ম কর্তব্যবুদ্ধির দ্বারা করা (গীতা ১৮।৯)। শাস্ত্রবিহিত কর্ম হল কর্তব্য—কেবল এই ভাবযুক্ত হয়ে আসক্তি এবং কামনা ত্যাগ করে কর্ম করলে সেই কর্ম বন্ধনকারক হয় না, বরং মুক্তিদায়ী হয়ে থাকে।

---

[১]'ইষ্টকামধুক্'-এর অর্থ হল 'যে কর্তব্যকর্ম করার সামগ্রী প্রদান করে।' এখানে যদি ইষ্ ধাতু থেকে 'ইষ্ট' পদের নিষ্পত্তি করা হয় তাহলে এই শ্লোকের প্রথম উপক্রমের (৩।৯) সঙ্গে বিরোধ উৎপন্ন হবে, কেননা তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে কর্তব্যকর্মের অতিরিক্ত কর্ম বন্ধনের সৃষ্টি করে। তাছাড়া নিজের কথাকে ব্রহ্মার বচন দ্বারা পুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এখানে কর্তব্যকর্ম করলে 'আকাঙ্ক্ষিত ভোগসামগ্রী প্রদানকারী'—এই অর্থ সঙ্গত মনে হয় না এবং এই প্রসঙ্গ থেকে উপসংহারে 'ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ' (৩।১৩)-এর সঙ্গেও বিরোধ হবে। অতএব 'ইষ্ট' পদ দেবপূজাসঙ্গতিকরণার্থক 'যজ্' ধাতুর দ্বারা নিষ্পন্ন হয়েছে, যার অর্থ হল—কর্তব্যকর্মের দ্বারা ভাবিত। যজ্+ক্ত, 'বচিস্বপিঃ' থেকে সংপ্রসারণ, 'ব্রশ্চভ্রস্‌জ' থেকে 'জ্'-কে 'ষ্' ততঃ ষ্টুত্ব—এইভাবে 'ইষ্ট' শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবেই ৩।১২-তেও ইষ্ট শব্দ 'যজ্' ধাতুর দ্বারাই নিষ্পন্ন মনে করতে হবে। 'কাম্যন্ত ইতি কামাঃ' এই ব্যুৎপত্তি থেকে কাম শব্দের অর্থ পদার্থ এবং সামগ্রী।

কর্মযোগ ঠিকভাবে পালন করলে জ্ঞান এবং ভক্তির প্রাপ্তি স্বতই হয়ে যায়। কর্মযোগ সাধন করলে কেবল নিজের নয়, উপরন্তু সংসারেরও পরম কল্যাণ হয়। অন্য লোক দেখুক বা নাই দেখুক, বুঝুক বা নাই বুঝুক ; নিজেদের কর্তব্যকর্ম ঠিকভাবে করলে অন্য লোকেদেরও কর্তব্য পালনের প্রেরণা স্বতই লাভ হয়।

অপরের সেবায় প্রীতির প্রাধান্য থাকায় কর্মযোগে উপভোগ্যতার বিনাশ অবশ্যই হয়ে যায়। এরই সঙ্গে ব্যক্তি ও বস্তু প্রভৃতি থেকে নিজের প্রাপ্তি এবং আকাঙ্ক্ষা না থাকার কারণে এবং মনুষ্যাদি সংগঠনের দ্বারা সংঘটিত ক্রিয়া প্রভৃতির সঙ্গেও নিজের সম্পর্ক না মানলে কর্তৃত্বভাবেরও স্বতই বিনাশ হয়ে যায়। কর্মযোগী ক্রিয়ায় রত থাকার সময় নিজেকে কর্তা মনে করে। উপভোগ্যতা এবং কর্তৃত্ব পরস্পর অবলম্বিত। যখন উপভোগ্য বিদূরিত হবে তখন কর্তৃত্বের অস্তিত্ব থাকবে না আর কর্তৃত্বই যদি না থাকে তাহলে উপভোগ্যতারও কোনো আধার থাকবে না। এই দুটির মধ্যেও উপভোগ্যতা ত্যাগ করা সহজ।

ভোগে বিভোর থাকার ফলে সেগুলির সংসর্গজনিত সুখাসক্তিতে এটি কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু যে পরিবার-পরিজন তথা অর্থাদিতে বিড়ম্বিত থেকেও নিজের উদ্ধার কামনা করে, তার কাছে কর্মযোগের প্রণালী খুবই সহজ। তাই ভগবান শ্রীমদ্ভাগবতে **'কর্মযোগস্তু কামিনাম্'** (১১।২০।৭) বলেছেন।

বস্তুত কর্মযোগের জন্যই মানব শরীর প্রাপ্ত হয়েছে। যে কোনো মার্গেরই সাধক হন না কেন তাঁকে কর্মযোগের প্রণালীকে স্বীকার করতেই হবে।

ভগবান গীতায় কল্যাণপ্রাপ্তির দুটি নিষ্ঠার কথা বলেছেন—(ক)জ্ঞানযোগ এবং (খ) কর্মযোগ। এই দুটির মধ্যে জ্ঞানপ্রাপ্তির অনেকগুলি উপায়ের অন্তর্গতরূপে শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে জ্ঞানার্জনের কথা গীতায় বর্ণিত হয়েছে।[১] যদিও ভগবান এই শাস্ত্রীয় পদ্ধতির দ্বারা প্রাপ্ত

[১]তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ (গীতা ৪।৩৫)

জ্ঞানের মহিমা কীর্তন করেছেন[১] তাহলেও শেষকালে সাধক কর্মযোগ প্রণালীর দ্বারা সেই তত্ত্বজ্ঞান নিজে থেকে অবশ্যই পেয়ে যাবেন—একথাও তিনি বলেছেন—

'তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি' (৪।৩৮)। তাৎপর্য হল জ্ঞানযোগ গুরু পরম্পরার (গীতা ৪।৩৫) অধীন এবং কঠিনও।[২] অন্যদিকে কর্মযোগের প্রণালীতে গুরুর অনিবার্যতা নেই,[৩] তা করা সহজ,[৪] ফলও শীঘ্র পাওয়া যায়।[৫] আর কর্মযোগের অনুষ্ঠান করলে তা অবশ্যই 'ফলপ্রাপ্তিদায়ী' হয়ে যায়—**'কালেনাত্মনি[৬] বিন্দতি'** (৪।৩৮)।

---

[১]যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥
যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎকুরুতে তথা॥ (গীতা ৪।৩৫-৩৭)

[২]সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি॥ (গীতা ৫।৬)

[৩]তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥ (গীতা ৪।৩৮)

[৪]জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥ (গীতা ৫।৩)

[৫]যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি॥ (গীতা ৫।৬)

[৬]'কালেন' এই শব্দে 'কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে' (পাণিনী সূত্র ২।৩।৫) থেকে প্রাপ্ত দ্বিতীয়া বিভক্তির প্রতিষেধ করে 'অপবর্গে তৃতীয়া' (পা.সূ. ২।৩।৬)—এই সূত্র অবলম্বন করে ফল প্রাপ্তির অর্থে তৃতীয়া বিভক্তি প্রযুক্ত হয়েছে। যদিও উক্ত সূত্রে কালবাচক শব্দে তৃতীয়ার বিধান রয়েছে তবুও কালাতীতে ব্যাপদেশের জন্য তো 'কাল' এবং 'নচির' প্রভৃতি শব্দগুলিরই প্রয়োগ হয়, অতএব 'নচিরেণ' (৫।৬) এবং 'কালেন' (৪।৩৮) থেকে এটি ধ্বনিত হয় যে কর্মযোগের দ্বারা শীঘ্র এবং অবশ্যই ফলের প্রাপ্তি হবে—এতে সন্দেহ নেই।

ভগবান সর্বসাক্ষী সূর্যকে সৃষ্টি করার প্রারম্ভে অনাদি কর্মযোগের উপদেশ এই জন্যই দিয়েছিলেন যে সূর্যের প্রকাশে অনেক কর্ম হয়ে থাকে, কিন্তু তিনি সেই সব কর্মের দ্বারা বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন না, তেমনই চেতনার সাক্ষীতে সকল কর্ম হলেও তা (সেই কর্ম) বন্ধনকারী হয় না। তবে তার সঙ্গে যদি সুখের সামান্য সম্বন্ধও থাকে তবে তা অবশ্যই বন্ধনকারী হয়ে যাবে। সূর্যে যেমন উপভোগ্যতা নেই, তেমনই কর্তৃত্বও নেই। সেই সঙ্গে কোনো অবস্থাতেই নিত্য কর্ম ত্যাগ না করা এবং নিত্য কর্ম সাধনে সব সময় তৎপর থাকা সূর্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। কর্মযোগীকেও এইভাবে নিজের নিত্য কর্ম প্রতিদিন যথাসময়ে করবার জন্য তৎপর থাকতে হবে। এইজন্য কর্মযোগের প্রকৃত অধিকারী সূর্যকে জেনেই ভগবান সর্বপ্রথম কর্মযোগের উপদেশ দিয়েছিলেন এবং সেই পরম্পরার উল্লেখ করে এই বিষয়ে গূঢ় রহস্য জানিয়েছিলেন—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্মনবে[১] প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্॥

(গীতা ৪।১-৩)

'আমি এই অবিনাশী যোগ বিবস্বান (সূর্য)-কে বলেছিলাম। সূর্য তাঁর পুত্র বৈবস্বত মনুকে বলেছিলেন আর মনু তাঁর পুত্র রাজা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। হে পরন্তপ অর্জুন ! এইভাবে পরম্পরাগত প্রাপ্ত এই যোগকে রাজর্ষিরা জেনেছেন। কিন্তু তার পর বহু কাল ধরে সেই যোগ এই পৃথিবীতে লুপ্তপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। তুমি আমার ভক্ত এবং প্রিয় সখা।

---

[১]বিশেষেণ বস্তে আচ্ছাদয়তি ইতি বিবস্বান্, বিপূর্বক, 'বস' ধাতু দ্বারা ক্বিপ্, মতুপ্ আদি প্রক্রিয়ার দ্বারা এই শব্দ সিদ্ধ হয়।

তাই এই সেই পুরাতন যোগের কথা আমি তোমাকে জানালাম, কেননা এটি খুবই গূঢ় রহস্য।'

সৃষ্টিতে যে সর্বপ্রথম জন্মগ্রহণ করে তাকেই কর্তব্যের উপদেশ দেওয়া যায়। উপদেশ দেওয়ার তাৎপর্য হল কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া। সৃষ্টিকালে সূর্যই প্রথম সৃষ্ট হয়েছিল। তারপর সূর্য থেকেই সমস্ত লোকের সৃষ্টি। আমাদের শাস্ত্রে সূর্যকে 'সবিতা' বলা হয়েছে, তার অর্থ সৃজনকারী ?

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও সূর্যকে সমগ্র সৃষ্টির কারণ বলে মানেন। সকলের সৃষ্টিকারী সূর্যকে সর্বপ্রথম কর্মযোগের উপদেশ দেওয়ার অভিপ্রায় হল তাঁর দ্বারা উৎপন্ন সমগ্র সৃষ্টির কাছে পরম্পরাগত কর্মযোগকে সুলভ করে দেওয়া।

কর্মযোগ সম্পর্কে ভগবানের দেওয়া উপদেশ সূর্য পালন করেছেন। ফলস্বরূপ এই কর্মযোগ পরম্পরাগতভাবে বংশ পরম্পরায় বহু কাল ধরে চলে এসেছে। জনক প্রমুখ রাজারা, বড় বড় সাধু-সন্তরা এবং মুনি-ঋষিরা এই কর্মযোগ আচরণ করে পরম সিদ্ধি লাভ করেছেন। অনেক কাল বিগত হওয়ার পর যখন এই যোগ লুপ্ত প্রায় হয়ে গিয়েছিল তখন ভগবান আবার সেই উপদেশ অর্জুনকে দিয়েছিলেন।

সূর্য হলেন সমগ্র জগতের নেত্র। সকলে তাঁর কাছ থেকেই জ্ঞান লাভ করেন। তিনি উদিত হলে সকলে জেগে ওঠে এবং নিজের নিজের কাজে লেগে যায়। মানুষের মধ্যে কর্তব্য-পরায়ণতা সূর্যের কাছ থেকেই আসে। এই অভিপ্রায়ের জন্য ভগবান সূর্যকে জগতের আত্মা বলে জানিয়েছেন—**'সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ'**। তাই যে উপদেশ সূর্য লাভ করেন তা সমস্ত প্রাণী স্বতই পেয়ে যায়। এই কারণেই ভগবান সর্বপ্রথম সূর্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

সকল প্রাণী উৎপত্তি হয় অন্ন থেকে আর অন্ন উৎপন্ন হয় বর্ষা থেকে। বর্ষার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন সূর্য। তিনিই নিজের কিরণের দ্বারা জলকে আকর্ষণ করে পৃথিবীতে বৃষ্টিরূপে বর্ষণ করেন। তাই সমস্ত প্রাণীর জীবন

ভগবান সূর্যের উপর আশ্রিত। সমগ্র সৃষ্টিচক্র সূর্যের আধারেই প্রতিষ্ঠিত।[১] সূর্য উপদিষ্ট হওয়ার পর তাঁর কৃপাতেই সংসার শিক্ষা লাভ করেছে। সূর্য যেমন পৃথিবী থেকে প্রাপ্ত জলকে প্রাণীদের হিতার্থে পৃথিবীতে আবার বর্ষণ করে দেন তেমনই রাজারাও প্রজাদের কাছ থেকে (কর আদি রূপে) প্রাপ্ত ধনকে প্রজাদের হিতের জন্য নিয়োজিত করার শিক্ষা তাঁর কাছেই গ্রহণ করেছেন।[২]

শ্রেষ্ঠ পুরুষরা যেমন আচরণ করেন, অন্য লোকরাও সেই রকম

---

[১]মহাভারতে সূর্যের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে—

ত্বং ভানো জগতশ্চক্ষুস্ত্বমাত্মা সর্বদেহিনাম্।
ত্বং যোনিঃ সর্বভূতানাং ত্বমাচারঃ ক্রিয়াবতাম্॥
ত্বং গতিঃ সর্বসাংখ্যানাং যোগিনাং ত্বং পরায়ণম্।
অনাবৃতার্গলদ্বারং ত্বং গতিস্ত্বং মুমুক্ষতাম্॥
ত্বয়া সংধার্যতে লোকস্ত্বয়া লোকঃ প্রকাশ্যতে।
ত্বয়া পবিত্রীক্রিয়তে নির্ব্যাজং পাল্যতে ত্বয়া॥

(মহাভারত, বনপর্ব ৩।৩৬-৩৮)

'সূর্যদেব ! আপনি সমগ্র জগতের নেত্র এবং সকল প্রাণীর আত্মা। আপনিই সকল জীবের উৎপত্তি স্থান এবং কর্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত পুরুষদের সদাচার।

আপনিই সকল সাংখ্যযোগীর প্রাপ্তব্য স্থান। আপনিই সকল কর্মযোগীর আশ্রয়। আপনিই মোক্ষের উন্মুক্ত দ্বার এবং আপনিই মুমুক্ষুদের গতি।

আপনিই সমগ্র জগৎকে ধারণ করে আছেন। আপনা হতেই এটি প্রকাশিত হয়। আপনিই এটিকে পবিত্র করেন এবং তার পালন আপনার দ্বারাই নিঃস্বার্থভাবে করা হয়।'

[২]মহারাজ দিলীপের প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাস লিখেছেন—

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥ (রঘুবংশ ১।১৮)

'যেমন সূর্য সহস্রগুণ বেশি বর্ষণ করবার জন্য পৃথিবীর জলকে আকর্ষণ করেন তেমনই সূর্যবংশী রাজাগণও প্রজাদের হিতের জন্য তাদের কাছ থেকে কর গ্রহণ করতেন।'

আচরণই করে থাকেন। তাই রাজা যেমন আচরণ করেন প্রজারাও সেই রকমই আচরণ করতে থাকেন—'যথা রাজা তথা প্রজা'। রাজাকে ভগবানের বিভূতি বলা হয়েছে **'নরাণাং চ নরাধিপম্'** (গীতা ১০।৩৭)। রাজাদের মধ্যে প্রথম স্থান হল সূর্যের। সূর্য এবং ভবিষ্যতে যাঁরা রাজা হবেন তাঁরা ওই কর্মযোগের আচরণ করবেন । সেইসব রাজা রাজত্ব ভোগে আসক্ত না হয়ে সুচারুরূপে রাজ্য সঞ্চালন করতেন। প্রজারঞ্জনে তাঁদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকত। কর্মযোগ সাধন করার ফলে রাজাদের এমন বিশেষ জ্ঞান হত যে বড় বড় ঋষিরাও জ্ঞানলাভের জন্য তাঁদের কাছে আসতেন। বেদব্যাসের ছেলে শুকদেবও জ্ঞানপ্রাপ্তির জন্য রাজা জনকের কাছে গিয়েছিলেন। ছান্দোগ্যপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে আছে যে ব্রহ্মবিদ্যা শেখার জন্য ছয় জন ঋষি একসঙ্গে মহারাজ অশ্বপতির কাছে গিয়েছিলেন।

শঙ্কা—যার জ্ঞান থাকে না তাকেই উপদেশ দেওয়া হয়। সূর্য তো স্বয়ংই জ্ঞানস্বরূপ ভগবান। তাহলে তাঁকে উপদেশ দেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল ?

সমাধান—যেমন অর্জুন মহান জ্ঞানী নরঋষির অবতার ছিলেন। কিন্তু লোকসংগ্রহের জন্য তাঁকেও উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। ঠিক তেমনই ভগবান সূর্যকে উপদেশ দিয়েছিলেন। তার ফলে সংসারের খুবই উপকার হয়েছিল এবং এখনও হচ্ছে।

বাস্তবে নারায়ণরূপে উপদেশ দেওয়া এবং সূর্যের রূপে উপদেশ গ্রহণ করা জগৎনাট্যসূত্রধার ভগবানের এক লীলা বলেই মনে করা উচিত, এটি সংসারের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় ছিল।

প্রাপ্ত তত্ত্বের অনুভূতি

দেখা এবং অ-দেখা দুটি জিনিস। যা দেখা যায় তা হল 'প্রতীতি'[১] এবং যা দেখা যায় না তা হল 'প্রাপ্ত'। প্রতীতিকে জড় (প্রকৃতি) বলা হয়, অসৎরূপে এর বর্ণনা করা যায় এবং প্রাপ্তকে চেতন (পুরুষ) বলা হয়—এর বর্ণনা করা হয় সৎরূপে—**'প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি'** (গীতা ১৩।১৯)। প্রতীতির তো স্বতন্ত্র সত্তা নেই এবং প্রাপ্তের সত্তা হয়ে থাকে—**'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' (গীতা ২।১৬)।**

জড় এবং চেতন—উভয়ে পরস্পরবিরোধী স্বভাববিশিষ্ট। জড় তো সদাসর্বদা বদলাতে থাকে, এক মুহূর্তও স্থির থাকে না ; আর চেতন চিরকাল যেমনকার তেমনই থাকে, এক মুহূর্তের জন্যও বদলায় না। যেমন রাত্রি এবং দিনের মধ্যে কখনো পরস্পর সংযোগ হতে পারে না তেমনই জড় ও চেতনের কখনো পারস্পরিক সংযোগ হতে পারে না। কিন্তু গীতায় বলা হয়েছে যে জড়-চেতনের সংযোগে সকল প্রাণীর সৃষ্টি হয়।[২] এর তাৎপর্য

---

[১]প্রতীতির দুটি ভিন্নতা আছে—প্রতীতি এবং আভাস। প্রতীতি হল ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং আভাস হল অন্তঃকরণের। প্রতীতি স্থূল এবং আভাস সূক্ষ্ম। সাংসারিক পদার্থ, ব্যক্তি প্রভৃতির প্রতীতি হয় এবং ইন্দ্রিয় অহং-এর হয় আভাস। তাৎপর্য হল প্রতীতি এবং অনুভূতি—এই দুই-এর মধ্যে আছে আভাস। আভাসের জ্ঞাতা স্বয়ং (আত্মা)।

[২]যাবৎসঞ্জায়তে কিঞ্চিৎসত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ।। (গীতা ১৩।১৬)

জ্ঞানের রুচিসম্পন্ন সাধক মনে করেন 'কোনো কিছুই নেই' আর ভক্তির রুচি সম্পন্ন সাধক মনে করেন 'সব কিছুই পরমাত্মা'। রুচিভেদ হলেও পরিণামে দুজনে এক হয়ে যান অর্থাৎ দুজনেরই এই অনুভূতি হয় যে এক পরমাত্মা ছাড়া আর কিছুই নেই।

হল চেতনই জড়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক মানে অর্থাৎ জড়-চেতনের সংযোগ কেবল চেতনের স্বীকৃতি, বস্তুর নয়—**'জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ'** (গীতা ৭।৫), **'মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি'** (গীতা ১৫।৭)। এই স্বীকৃত সংযোগকে ছাড়ার দায়ও চেতনের উপর, কেননা সেই জড়কে ধরেছে।

যখন চেতন জড়ের সঙ্গে তার সম্বন্ধ মেনে নেয় তখন তদাত্ম্যরূপ অহং সৃষ্ট হয়। এই অহং কেবল চেতনেই নেই এবং কেবল জড়েও নেই। তা আছে জড়-চেতনের স্বীকৃত সংযোগে (চিজ্জড়গ্রন্থিতে)। এই অহং-ই সংসার বন্ধনের মূল কারণ। এই অহং হতেই মমতা, কামনা প্রভৃতি অনেক দোষের উৎপত্তি হয়। সুতরাং এই অহংকে দূর করবার জন্য সাধক হয় সাংসারিক দৃষ্টিতে এইটি মেনে নিন যে 'সংসারের কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, আর নয়তো পরমাত্মার দৃষ্টিতে এইটি মেনে নিন যে সব কিছুই পরমাত্মা।'

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান সংসারের দৃষ্টিতে বলেছেন—

কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দ্বৈতস্যাবস্তুনঃ কিয়ৎ।
বাচোদিতং তদনৃতং মনসা ধ্যাতমেব চ॥ (১১।২৮।৪)

'বাণীর দ্বারা সংসারের সব বস্তুর কথা বলা যেতে পারে এবং মনের দ্বারা চিন্তা করা যেতে পারে, অতএব এগুলি সব অসত্য। অতএব যখন দ্বৈত নামে কোনো বস্তুই নেই, তখন তার মধ্যে ভালোই বা কী এবং খারাপই বা কী ?'

পরমাত্মার দৃষ্টিতে বলা হয়েছে—

মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা॥ (১১।১৩।২৪)

'মনের দ্বারা, বাণীর দ্বারা, দৃষ্টির দ্বারা এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা[১] যা

[১]এখানে 'মনসা'-র দ্বারা অন্তঃকরণ, 'বচসা'-র দ্বারা সব কর্মেন্দ্রিয় এবং 'দৃষ্ট্যা'-র দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে বুঝতে হবে।

কিছু গ্রহণ করা হয় তা সবই আমি। সুতরাং আমি ছাড়া আর কেউ নেই—এই সিদ্ধান্ত আপনারা বিবেচনা সহকারে তাড়াতাড়ি মেনে নিন।'

যার সত্তা আছে তাকেই গ্রহণ করা যায়। সংসারের কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই। তা এক মুহূর্তও থাকতে পারে না। তাহলে তাকে কী করে গ্রহণ করা যেতে পারে ? চেতনের দ্বারাই চেতনকে গ্রহণ করা হয়। স্বয়ং (আত্মা) হলেন চেতন, অতএব সেই চেতনই পরমাত্মতত্ত্বকে গ্রহণ করে, জড়কে নয়। কিন্তু স্বয়ং যখন জড়ের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক মেনে নেয় তখন তা জড় শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির দ্বারা জড়তাকেই গ্রহণ করে। জড়তাকে গ্রহণ করলে সে চিন্ময় তত্ত্ব (পরমাত্মা) থেকে বিমুখ হয়ে যায় এবং তার মধ্যে জড়তা (শরীর)-এর প্রাধান্য হয়ে যায়। জড়তার প্রাধান্য দূর করতে সাধকের উচিত হল তিনি 'কোনো কিছুই নেই' এই বাস্তবিকতাকে যেন দৃঢ়তার সঙ্গে মেনে নেন।[১] এই রকম মেনে নিলে জড়তার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হবে এবং 'সব কিছুই পরমাত্মা' এই অনুভূতি এসে যাবে।[২] তাৎপর্য হল তার দ্বারা জড়তাকে গ্রহণ করা হবে না, বরং পরমাত্মাকেই গ্রহণ করা হবে।

যেমন মানুষের দৃষ্টি যখন গহনার দিকে, তার নাম, রূপ, আকৃতি, ওজন, দাম, ব্যবহারের দিকে যায় তখন তার দৃষ্টি সোনার প্রাধান্যের দিকে থাকে না। তেমনই, যখন মানুষের দৃষ্টি সংসারের দিকে থাকে তখন তার দৃষ্টি পরমাত্মার দিকে যায় না। যদি সে দৃঢ়তার সঙ্গে এই কথা মেনে নেয় যে 'কোনো কিছুই নেই' তাহলে তার দৃষ্টিতে সংসারের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অবিদ্যমান হয়ে যাবে এবং 'সব কিছু পরমাত্মা' এটি অনুভূত হবে। তাৎপর্য হল তার দৃষ্টিতে সংসার থাকবে না, থাকবেন পরমাত্মা—**'বাসুদেবঃ সর্বম্'** (গীতা ৭।১৯)। এইটিই হল বাস্তব।

---

[১]'দেখিঅ সুনিঅ গুনিঅ মন মাহীঁ। মোহ মূল পরমারথু নাহীঁ॥'
(শ্রীরামচরিতমানস ২।৯২।৪)

[২]জড় চেতন জগ জীব জত সকল রামময় জানি।
(শ্রীরামচরিতমানস ১।৭)

যেমন, যে মানুষ সোনাকে জানে সে সোনা এবং গহনা দুটিকেই জানে। তেমনই পরমাত্মতত্ত্বকে জানেন যে তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ তিনি সত্তাযুক্ত পরমাত্মা (প্রাপ্ত)-কেও জানেন আবার সত্তারহিত সংসার (প্রতীতি)-কেও জানেন—

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ (গীতা ২।১৬)

'অসতের ভাব (সত্তা) বিদ্যমান নেই এবং সৎ-এর অ-ভাব বিদ্যমান নেই। তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ এই দুটিরই শেষ অর্থাৎ তত্ত্ব দেখেছেন।'

অ-সৎ (প্রতীতি)-এর দুটি বিভাগ—শরীর এবং সংসার। শরীরকে সংসারের সেবায় সমর্পিত করা হল 'কর্মযোগ' এবং সংসারে সুখ চাওয়া হল 'জন্মমরণযোগ'। সৎ (প্রাপ্ত)-এর দুটি বিভাগ—আত্মা এবং পরমাত্মা। আত্মার নিজেতেই নিজের স্থিত হয়ে যাওয়া হল 'জ্ঞানযোগ' এবং নিজেই নিজেকে পরমাত্মায় সমর্পিত করে দেওয়া হল 'ভক্তিযোগ'। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ তিনটির কোনো একটিতে পূর্ণ হয়ে গেলে মেনে নেওয়া অহং-এর বিনাশ হয়ে যাবে।

প্রতীতি করণ-সাপেক্ষ, এবং যা প্রতীতির অতীত পরমাত্মতত্ত্ব (প্রাপ্ত) তা হল করণ-নিরপেক্ষ। অতএব পরমাত্মতত্ত্বের অনুভূতি অভ্যাসসাধ্য নয় অর্থাৎ তার অনুভূতির জন্য শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি করণগুলির বিন্দুমাত্র অপেক্ষা (প্রয়োজনীয়তা) নেই। এগুলির প্রয়োজন কেবল সংসারের জন্য, নিজের জন্য নয়।

অভ্যাসের দ্বারা কেবল অবস্থার পরিবর্তন এবং এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়। অবস্থার অতীত সত্তার অনুভূতি অভ্যাসের দ্বারা হয় না, তা হয় অনভ্যাসের দ্বারা। অনভ্যাসের অর্থ—কিছু না করা। প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধের ফলেই যা কিছু করা হয়। প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়া চেতন কিছু করতেই পারে না, করাটা হয়ই না। তাই তার উপর কিছু করার দায়ও নেই। চেতনে তো কর্তৃত্বই নেই, তাহলে তাতে ক্রিয়া হবে কী করে ? যদি লেখকই

না থাকে তাহলে লেখা-রূপী ক্রিয়া কী করে হবে ? চেতন কেবল অহংকারে মোহিত হয়ে নিজের মধ্যে কর্তৃত্ব মেনে নিতে পারে— **'অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'** (গীতা ৩।২৭) ; বাস্তবে সে কর্তাও নয়, ভোক্তাও নয়—**'ন করোতি ন লিপ্যতে'** (গীতা ১৩।৩১)। অতএব তত্ত্ব অনুভব করার জন্য ক্রিয়া এবং পদার্থকে গুরুত্ব দেওয়া হল প্রচণ্ড অজ্ঞানতা। ক্রিয়া এবং পদার্থের উপেযোগ সংসারের হিতের জন্য। নিজেদের হিতের জন্য তো এ থেকে সর্বতোভাবে সরে আসতে হবে।

তত্ত্বের অনুভূতি প্রতীতির দ্বারা হয় না, তা হয় প্রতীতিকে ত্যাগ (সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ)-এর দ্বারা। কারণ হল প্রতীতির আশ্রয় বন্ধনকারী—**'কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু'** (গীতা ১৩।২১)। প্রতীতির সাহায্য না নিলে অভ্যাস করা যায় না, যার আশ্রয় নেওয়া হয় তাকে ত্যাগ করা হবে কী করে ? তাতে তো তার গুরুত্বই বেড়ে যায়। এইজন্য তত্ত্বকে অভ্যাসসাধ্য মেনে নিলে যে বড় অসুবিধা সৃষ্টি হয় তা হল এই যে, যার দ্বারা বন্ধন হয় মানুষ তাকেই তত্ত্বপ্রাপ্তির সহায়ক মনে করে এবং তারই গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। অতএব অভ্যাসের ফলে বন্ধন অথবা প্রতীতির পরাধীনতা যেমনকার তেমনই সুরক্ষিত থাকে। এই কারণে প্রতীতিকে ত্যাগ করা খুব শক্ত হয়ে যায়। যেমন শৃঙ্খল লোহারই হোক কিংবা সোনার, তাতে বন্ধনে কোনো পার্থক্য হয় না। যে পার্থক্য হয় তা হল লোহার শৃঙ্খল ত্যাগ করা সহজ, কিন্তু সোনার শৃঙ্খল ত্যাগ করা খুবই কঠিন কাজ ; কেননা মনের মধ্যে সোনার খুবই গুরুত্ব থাকে।

স্বয়ং (স্বরূপ)-এর সামনে থাকে একটি প্রতীতি (সংসার) এবং একটি প্রাপ্ত (পরমাত্মা)। প্রতীতির সম্মুখস্থ হওয়া হল বন্ধন আর প্রাপ্তর সম্মুখস্থ হওয়া হল মুক্তি। বাস্তব দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে যে মুক্তির অবিদ্যমানতা কখনোই হয়নি, তা কখনই হয় না, হবে না এবং হতে পারে না। প্রাপ্তের সত্তা না মেনে প্রতীতির সত্তা মেনে নেওয়াই হল বন্ধন এবং প্রতীতির সত্তা না মেনে প্রাপ্তের সত্তা অনুভব করা হল মুক্তি। অতএব বন্ধন এবং মোক্ষ কেবল স্বীকৃতির মধ্যেই আছে, স্বরূপে নেই।

প্রশ্ন—যা প্রাপ্ত সেই পরমাত্মতত্ত্বকে দেখা যায় না এবং যা প্রতীতি সেই সংসারকে দেখা যায়—এর কারণ কী ?

উত্তর—যেমন, শরীরের প্রধান আধার হল হাড়, কিন্তু তা দেখা যায় না। চামড়া প্রধান আধার নয়, তাকে দেখা যায়। যাতে শক্তি সেই জিনিস দেখা যায় না আর যে জিনিস দেখা যায় তাতে শক্তি নেই। পরমাত্মাও তেমনই জগৎ-সংসারের প্রধান আধার হলেও তাঁকে দেখা যায় না, বরং সংসারকেই দেখা যায়। বাস্তবে যা বিদ্যমান তাকে দেখা যায় না আর যাকে দেখা যায় বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই।

হাড় পিতার অংশ থেকে এবং চামড়া মায়ের অংশ থেকে উৎপন্ন হয়[১]। অতএব শরীর হল মা-বাবার অংশ। কিন্তু শরীরে মাকেও দেখা যায় না, বাবাকেও দেখা যায় না। এইভাবে সংসার প্রকৃতি ও পরমাত্মার সংযোগে উৎপন্ন হয়।[২] কিন্তু সংসারে প্রকৃতিকেও দেখা যায় না এবং পরমাত্মাকেও দেখা যায় না। কেবল প্রকৃতির কাজই দেখা যায়।

শরীরের গলা থেকে উপরের অংশকে 'উত্তমাঙ্গ' বলা হয়, কেননা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় তাতে স্থিত। উত্তমাঙ্গের মধ্যেও 'মুখ' হল প্রধান। কেননা রসনা (জ্ঞানেন্দ্রিয়) এবং বাক (কর্মেন্দ্রিয়)—এই দুইটি মুখে অবস্থিত। শরীরের অন্য কোনো অঙ্গে দুটি

---

[১]অস্থি স্নায়ুশ্চ মজ্জা চ জানীমঃ পিতৃতো গুণাঃ।
ত্বঙ্মাংসং শোণিতং চেতি মাতৃজান্যপি শুশ্রুম॥
(মহাভারত, শান্তিপর্ব ৩০৫।৫-৬)

'হাড়, স্নায়ু এবং মজ্জা এইগুলি আমি বাবার কাছ থেকে পাওয়া গুণ মনে করি এবং চামড়া, মাংস এবং রক্ত এইগুলি মায়ের কাছ থেকে পাওয়া গুণ বলে আমি শুনেছি।'

[২]মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্‌গর্ভং দধাম্যহম্‌।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥
(গীতা ১৪।৩-৪)

ইন্দ্রিয় এক সঙ্গে অবস্থিত নয়। হাড়ও মুখেই দাঁত রূপে দেখা যায়। জীবন্মুক্ত, তত্ত্বজ্ঞ, মহাপুরুষকেও তেমনই সংসারে মুখের মতো জানা চাই। মুখ প্রায়ই বন্ধ থাকে, কিন্তু বিশেষভাবে প্রসন্ন হলে মুখ উন্মুক্ত হয় আর তখন দাঁত দেখা যায়। তেমনই জিজ্ঞাসুর কাছে এলে মহাপুরুষরা বিশেষ প্রসন্ন হন আর তখন পরমাত্মার বোধ প্রকট হয়ে যায়—

'ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরুবো গুহ্যমপ্যুত।'

(শ্রীমদ্ভাগবত ১।১।৮, ১০।১৩।৩)

গূঢ়উ তত্ত্ব ন সাধু দুরাবহিঁ। আরত অধিকারী জহঁ পাবহিঁ॥

(শ্রীরামচরিতমানস ১।১১০।১)

বাছুর কাছে এলে যেমন গোরুর স্তনে দুধ এসে যায় তেমনই জিজ্ঞাসু কাছে এলে মহাপুরুষদের কৃপা উছলে পড়ে। জিজ্ঞাসু নিজের জিজ্ঞাসা অনুসারে যতটা জ্ঞান নিতে পারে ততটাই নিয়ে নেয়।

করণ-নিরপেক্ষ পরমাত্মতত্ত্ব

শ্রোতা—করণ-নিরপেক্ষ সাধনার দৃষ্টিতে আপনি যে কর্তব্যের কথা বলেন তার স্বরূপ কী ?

স্বামীজী—আপনারা করণ-নিরপেক্ষ সাধনার উপর জোর দেবেন না। বরং ভগবানকে প্রাপ্ত করার জন্য জড় বস্তুর (করণ প্রভৃতির) প্রয়োজন নেই—এটিকে গুরুত্ব দিন। আপনারা তো শুনেছেন যে যেমন করণ তেমনিই কারকও বিভিন্ন প্রকারের হয়। কারক ছয় রকমের—কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান এবং অধিকরণ। কারক শব্দের কী অর্থ ? যার দ্বারা ক্রিয়া সিদ্ধ হয় তাকে কারক বলে। কারক ছাড়া কোনো ক্রিয়া হতে পারে না। সেজন্য ব্যাকরণে যেখানে এটি আলোচনা করা হয়েছে সেখানে প্রথমে এই অর্থ করা হয়েছে যে, যা ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত সেটিই হল কারক। এই সম্পর্কে আরও আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে ষষ্ঠী কারক নয়, কেননা ক্রিয়ার সঙ্গে তার সরাসরি সম্বন্ধ নেই। কিন্তু '**রাজ্ঞঃ পুরুষঃ গচ্ছতি**' 'রাজার পুরুষ যায়'-এতে রাজার সম্বন্ধ পুরুষের সঙ্গে এবং পুরুষের সম্বন্ধ গমনরূপী ক্রিয়ার সঙ্গে থাকায় পরম্পরানুসারে রাজার সম্বন্ধও ক্রিয়ার সঙ্গে হয়ে গিয়েছে। অতএব রাজা কি কারক হবে না ? এই রকম সংশয় উৎপন্ন হওয়ায় নির্ণয় করা হয়েছে যে, যা ক্রিয়াকে সৃষ্টি করে তাই হল কারক—'**ক্রিয়াজনকত্বম্ কারকত্বম্**'।

প্রত্যেক ক্রিয়ার আরম্ভ ও শেষ হয়। এই অভিজ্ঞতা সকলেরই। যেমন, আমি বক্তৃতা শুরু করেছি, এর সমাপ্তিও হবে। আপনারা যে কাজই করুন তার আরম্ভও হবে, শেষও হবে। যার আরম্ভ এবং শেষ হয় তা অনন্তের প্রাপক নয়। যে স্বয়ং উৎপন্ন হয় এবং সমাপ্তও হয় সে কী করে অনন্ত হবে ? প্রত্যেকটি বস্তু, ব্যক্তি, পরিস্থিতি, ক্রিয়া উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট হয়।

উৎপন্ন হওয়া এবং বিনষ্ট হওয়া হল ক্রিয়া আর যা উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় তা হল পদার্থ। উৎপন্ন এবং বিনষ্ট হয় যে জড়, তার দ্বারা অনুৎপন্ন চিন্ময়তত্ত্ব প্রাপ্ত হয় না, বরং জড়কে ত্যাগ করলেই চিন্ময়তত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। তাই করণ-নিরপেক্ষতার অর্থ কেবল করণরহিত হওয়া নয় উপরন্তু কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ—এই ছয়টি কারক থেকেই মুক্ত। প্রত্যেকটি কারক ক্রিয়াজাত হয় আর ক্রিয়ার উৎপত্তি ও সমাপ্তি হয়। উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় যে ক্রিয়া, তার দ্বারা অনুৎপন্ন তত্ত্বের প্রাপ্তি কী করে হতে পারে ? সুতরাং পরমাত্মতত্ত্ব কর্তা-নিরপেক্ষ, কর্ম-নিরপেক্ষ, করণ-নিরপেক্ষ, সম্প্রদান-নিরপেক্ষ, অপাদান-নিরপেক্ষ এবং অধিকরণ-নিরপেক্ষ। তাৎপর্য হল, কোনো কারকই পরমাত্মাকে ধরতে পারে না, কেননা সব কারকই উৎপন্ন এবং সমাপ্ত হয়। যা উৎপন্ন এবং সমাপ্ত হয় তাকে ত্যাগের দ্বারা অনুৎপন্ন তত্ত্বের প্রাপ্তি যদি না হয় তাহলে আর কী প্রাপ্ত হবে ? উৎপন্ন হয় এবং বিনষ্ট হয় এমন জিনিসের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ামাত্রই অনুৎপন্ন তত্ত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সেটি অনুভূত হয়।

বাস্তবে অনুৎপন্ন তত্ত্ব অপ্রাপ্ত নয়। উৎপন্ন হয় এমন পদার্থ, বস্তুর আশ্রয় গ্রহণই হল তার প্রাপ্তিতে বাধা। উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় এমন ক্রিয়া, বস্তু, পরিস্থিতি, অবস্থা, ঘটনা প্রভৃতির প্রতি যে গুরুত্ব অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত, সেইগুলিই সেই তত্ত্বপ্রাপ্তির বাধা। সেজন্য করণ-নিরপেক্ষ বলার তাৎপর্য করণের সঙ্গে বিরোধ করা নয়। আসল তাৎপর্য হল, যে বস্তু উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয় তার দ্বারা অনুৎপন্ন তত্ত্বের প্রাপ্তি হয় না।

শ্রোতা—বিনাশশীলের প্রতি গুরুত্ব কী করে দূর হবে ?

স্বামীজী—অপরের হিতসাধনে। নিজেদের শক্তি অনুসারে অপরের হিতসাধন করুন। অন্নক্ষেত্র খুলুন, জলসত্র খুলুন, ঔষধালয় স্থাপন করুন, এইভাবে মানুষের কল্যাণের ভাবনা এলে বিনাশশীলের প্রতি গুরুত্ব দূর হবে। আমরা যে বস্তু লাভ করি, এটি হল জড়কে আকর্ষণ করা। আর যত দিন জড়কে আকর্ষণ করতে থাকবেন ততদিন চিন্ময়তত্ত্বের প্রাপ্তি হবে না। এই বস্তুগুলির দ্বারা অপরের কল্যাণ হবে—এটি যখন হবে কেবল তখনই ক্রিয়া এবং পদার্থের প্রবাহ লোক-কল্যাণের দিকে যাবে এবং

চিন্ময়তত্ত্ব অবশিষ্ট থেকে যাবে, তার প্রাপ্তি হবে। জড় তো স্বতই বিনষ্ট হয়। জড়ের প্রতি আকর্ষণ থাকে কিন্তু জড় থাকে না। বাল্যাবস্থা কি থেকেছে ? যদি না থেকে থাকে যুবাবস্থা কি থাকবে ? ধনাঢ্য অবস্থা কি থাকবে ? এইগুলি থাকুক এবং আমার কাজে লাগুক—এই আকাঙ্ক্ষাই হল বাধা। এখন যদি কেবল এই ভাব আসে যে অপরের কল্যাণ হোক, অপরের ভালো হোক, তাহলে জড়তার ত্যাগ হবে আর ত্যাগ হলে তখনই পরম শান্তি লাভ হবে—**'ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্'** (গীতা ১২।১২)। তাহলে করণ-নিরপেক্ষতার তাৎপর্য ত্যাগে। জড়ের সহায়তা জড় প্রাপ্তিতে উপযোগী হতে পারে। কিন্তু চিন্ময়তত্ত্ব প্রাপ্তিতে জড়ের সহায়তা কার্যকর হয় না।

আর একটি কথা বলছি। কোনো লোক সদাব্রত খুললে তাঁর কি এই লক্ষ্য থাকে পৃথিবীর সব লোকের ক্ষুধা মিটিয়ে দেবেন ? **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'**-এর অর্থ কি এই যে আমি সকলের হিতসাধন করব ? তা নয়। এর তাৎপর্য নিজের শক্তি অপরের সেবায় নিযুক্ত করা। সকলের ক্ষুধা দূর করার, সকলের দুঃখ দূর করার দায় আপনি নেননি। আমি যতটুকু অন্ন গ্রহণ করি তার অতিরিক্ত যে অন্ন আমার কাছে আছে তা যেন অপরের সেবায় লাগে। **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'**-এর তাৎপর্য হল নিজের স্বার্থ ত্যাগ করা। কারণ হল, স্বার্থের প্রতি যে লোভ সেইটিই বাধা। তেমনই বস্তু, পদার্থ, ব্যক্তি, অবস্থার সম্পর্কে মনে যে গুরুত্ব অঙ্কিত আছে সেইটিই পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তির বাধক। যখন সমগ্র বিশ্ব মিলিতভাবেও একজন মানুষের সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পূর্তি করতে পারে না, তাকে সুখী করতে পারে না তখন একজন মানুষ সমগ্র বিশ্বের পূর্তি কী করে করবে ? নিজের সম্পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করাই হল দায়, অপরের দুঃখ দূর করা দায় নয়।

শ্রোতা—আমাদের সমস্ত সময় তো জড়তার প্রাপ্তিতেই লেগে যায়।

স্বামীজী—তাহলে আর পরমাত্মার প্রাপ্তি হবে না, যাই হোক না কেন ! গীতায় পরিষ্কার বলা আছে যে, জড় বস্তু থেকে সুখ ভোগ করা এবং তা সংগ্রহ করা—যাদের এই দুটিতে আসক্তি থাকে তাদের মধ্যে পরমাত্মাকে লাভ করার বাসনাই থাকতে পারে না, পরমাত্মাকে লাভ করা তো দূরের কথা। (গীতা ২।৪৪)। সংসারে আমার নাম হোক, আমি আরাম পাই,

ধনবান হই—এই রকম জড় বস্তুগুলির প্রতি লালসা যতক্ষণ মনে থাকবে ততক্ষণ চিন্ময় তত্ত্বের প্রাপ্তি হবে না। করণ-নিরপেক্ষতার এইটিই হল তাৎপর্য। আপনারা মন দিন। করণ-নিরপেক্ষতার অর্থ পরমাত্মতত্ত্ব প্রাপ্তিতে জড়ের প্রত্যাশা না করে, জড় ত্যাগের প্রত্যাশা করা। ক্রিয়া এবং পদার্থ, ব্যক্তি এবং বস্তু, অবস্থা এবং পরিস্থিতি—এগুলির দ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না, এগুলিকে উপেক্ষা করলে, ত্যাগ করলে, অন্তর থেকে এদের গুরুত্ব দূর হয়ে গেলে তখনই তা প্রাপ্ত হয়ে যাবে, কেননা পরমাত্মা অপ্রাপ্ত নন, বরং তিনি নিত্য-প্রাপ্ত। সংসার অপ্রাপ্ত, অথচ তাকেই প্রাপ্ত মনে করেন। তাকে প্রাপ্ত করতে চান। এইটিই বাধা। এই বাধা সহজেই দূর হয়—'**সর্বভূতহিতে রতাঃ**' হলে। সকল প্রাণীর কল্যাণের প্রতি যেন আমাদের প্রীতি থাকে। প্রীতি হলে কী হবে ? স্বার্থের যে ভাবনা, ব্যক্তিগত সুখভোগের যে ইচ্ছা, তা দূর হবে এবং তা যত দূর হবে আপনারা ততই চিন্ময়তত্ত্বের কাছাকাছি পৌঁছাবেন। সেই তত্ত্বের প্রতি বিমুখতা এসেছে, ভিন্নতা আসেনি।

অন্যকে সুখদান করলে নিজের সুখভোগের ইচ্ছা দূর হয়। মা শিশুকে পালন করেন। তাই তিনি তাকে ক্ষুধার্ত রাখতে পারেন না, বরং নিজে অভুক্ত থাকেন। এইভাবে সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ করার ইচ্ছা জোরদার হলে নিজের স্বার্থবুদ্ধির ত্যাগ সহজেই হয়ে যাবে।

শ্রোতা—দুটি কথা বুঝতে পারছি, জড়তাকে ত্যাগ করতে হবে এবং অন্তঃকরণকে সাধনরূপে প্রযুক্ত না করা।

স্বামীজী—সাধনায় প্রযুক্ত না করার তাৎপর্য হল, এটি আমাদের নয়, আমাদের জন্য নয়, এটি অন্যদের, অন্যদের জন্য। অন্তঃকরণ আমাদের জন্য নয়, বহিঃকরণও আমাদের জন্য নয়। ইন্দ্রিয়গুলি আমাদের জন্য নয়, শরীর আমাদের জন্য নয়, সম্পত্তিও আমাদের জন্য নয়। যা কিছুকে আমাদের বলে মনে করা হয় তা আমাদের নয়, আমাদের জন্যও নয়। এই দুটি কথা দৃঢ় নিশ্চয় করতে হবে। স্বার্থবুদ্ধি, সংগ্রহবুদ্ধি, সুখবুদ্ধি, ভোগবুদ্ধি হওয়া উচিত নয়, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। এইটিই হল করণ-নিরপেক্ষতার তাৎপর্য।

করণ কার নাম ? যে সাধনার পর তখনই ক্রিয়ার সিদ্ধি লাভ হয় তার নাম করণ। যথা, **'রামেণ বাণেন হতো বালী'** 'রামের বাণে বালি মারা গেল'। এতে বালির মৃত্যুতে বাণ হেতু হল। অতএব বাণ হল করণ। যদিও বাণ চালনায় ধনুক, ছিলা, হাত প্রভৃতি সবই হেতু তবু বালি বাণেতে মারা যায়, ধনুক, ছিলা প্রভৃতিতে নয়। অতএব যে বাণে বালির মৃত্যু হয় সেই বাণকে করণ বলা হবে। করণের দ্বারা ক্রিয়ার সিদ্ধি হয়, তার দ্বারা পরমাত্মার প্রাপ্তি কী করে হবে ?

শ্রোতা—মহারাজ ! ক্রিয়ার সিদ্ধিতে তো কর্তাও থাকে ?

স্বামীজী—হ্যাঁ, কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ সবই থাকে।

শ্রোতা—তাহলে কেবল করণ-নিরপেক্ষ কী করে হল ?

স্বামীজী—করণ-নিরপেক্ষ এইজন্য বলেছি যে করণের কার্যের পরই ক্রিয়ার সিদ্ধি হয়। করণের লক্ষণ বলা হয়েছে—**'সাধকতমং করণম্'** (পাণিনীর ব্যাকরণসূত্র, অঃ ১।৪।৪২)। সাধক নয়, সাধকতর নয়, সাধকতম বলা হয়েছে। ক্রিয়ার সিদ্ধিতে যা অত্যন্ত উপকারক তার নাম 'করণ'। অতএব অত্যন্ত উপকারক যে কারক সেই করণও যার প্রাপ্তিতে হেতু নয় তাহলে অন্য কারক কী করে হেতু হবে ? করণ-নিরপেক্ষ বলার এইটিই তাৎপর্য।

শ্রোতা—একে যদি কারক-নিরপেক্ষ বলা হয় তাতে আপত্তি কী ?

স্বামীজী—কারক-নিরপেক্ষ বলতেই পারেন। কিন্তু ক্রিয়ার নিষ্পত্তি করণের পরেই হয়—**'ক্রিয়ায়া নিস্পত্তির্যদ্ব্যাপারাদনন্তরং করণত্বং ভবেৎ তেন'**। ক্রিয়া হওয়ার দরুন সকল কারক করণ হয়ে যায়—**'ক্রিয়াজনকত্বং কারকত্বম্'**, কিন্তু করণের কার্যেই ক্রিয়া সিদ্ধ হয়। অতএব করণ-নিরপেক্ষ বলায় কারক-নিরপেক্ষও হয়ে গেল।

শ্রোতা—এর অর্থ কি এই যে করণের দ্বারা আমরা যে ক্রিয়া করি তা **'সর্বভূতহিতে রতাঃ'** হওয়া চাই ?

স্বামীজী—মন দিয়ে শুনুন। পরমাত্মা ক্রিয়ারূপ নন, তাই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করতে সকল প্রাণীর হিতসাধন কারণ নয়, বরং সকল প্রাণীর হিত-

সাধনার ভাবনা হল কারণ। সুতরাং নিজের ভাব, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, যদি পরিবর্তন করা যায় তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে। যেমন ভাব, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য হবে তারই অনুসারে আচরণ হবে। তাই লক্ষ্য হয় অপরের হিতসাধন করা, নিজেদের স্বার্থ এবং সুখ নয়।

শ্রোতা—রাম প্রথমে বালিকে মারবেন বলে স্থির করেছিলেন তারপর বাণের সাহায্য নিয়েছিলেন। যদি বাণকে কাজে না লাগাতেন তাহলে কি কেবল স্থির করার দ্বারা বালির মৃত্যু ঘটান যেত ?

স্বামীজী—ক্রিয়ার সিদ্ধিতে কারণের অপেক্ষা থাকে। পরমাত্মা ক্রিয়ার বিষয়ই নন। করণ যদি বিশেষ হয় তাহলে ক্রিয়া বিশেষ হবে, কর্তা বিশেষ হবে কী করে ? কলম ভালো হলে লেখাটা ভালো হলে লেখকও ভালো হবেন এমন কথা নেই। কল্যাণ কার হবে করণের না কর্তার ? মুক্তি করণের হবে, নাকি কর্তার ? করণের দ্বারা কর্তার মুক্তি কী করে হবে ? করণের দ্বারা তো ক্রিয়া হবে।

ক্রিয়ার সিদ্ধিতে করণ প্রধান। অতএব করণ-নিরপেক্ষ বললে স্বতই কারক-নিরপেক্ষ হয়ে গেল। কারকের দ্বারা ক্রিয়ার সিদ্ধি হয়ে যাবে। জগতের কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু পরমাত্মা লাভ হবে কী করে ?

শ্রোতা—আপনি বলেন যে পরমার্থের কাজ করা চাই, অন্নক্ষেত্র, জলসত্র খোলা চাই। তাহলে সেগুলির ফল ভোগ করতে আবার জন্ম নিতে হবে। এইভাবে জন্ম-মৃত্যু থেকে তো কখনোই মুক্তি হবে না ?

স্বামীজী—পারমার্থিক কাজে কল্যাণ হয় না। কল্যাণ নিষ্কাম ভাবে হয়। বন্ধন কামনা থেকে হয়। কামনা না থাকলে কল্যাণই হবে, তাছাড়া আর কী হবে ? জন্ম-মৃত্যুর কারণই তো কামনা। অতএব কামনাকে ত্যাগ করুন।

গোরক্ষপুরের গীতাপ্রেস দ্বারা এযাবৎ প্রকাশিত বাংলা বই-এর সূচিপত্র

● শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (সাত প্রকারের বিভিন্ন রূপে-আকারে) ● গীতা-দর্পণ ● গীতা-মাধুর্য ● শ্রীরামচরিতমানস ● সংক্ষিপ্ত মহাভারত ● শ্রীমদ্ভাগবত ● কল্যাণ প্রাপ্তির উপায় ● ভগবৎপ্রাপ্তির পথ ও পাথেয় ● উপনিষদ্ ● ঈশ্বর এবং ধর্ম কেন ? ● পাতঞ্জল যোগ ● কর্তব্য সাধনায় ভগবৎপ্রাপ্তি ● অমৃত-বিন্দু ● প্রশ্নোত্তর মণিমালা ● মুক্তি কি গুরু ছাড়া হবে না ? ● তত্ত্বজ্ঞান কী করে হবে ? ● কল্যাণকারী প্রবচন ● বিবেক চূড়ামণি ● স্তোত্ররত্নাবলী ● সাধকদের প্রতি ● আদর্শ গল্প সংকলন ● শিক্ষামূলক কাহিনী ● পরমার্থ পত্রাবলী ● সহজ সাধনা ● তাত্ত্বিক প্রবচন ● সাধন এবং সাধ্য ● মানব কল্যাণের শাশ্বত পথ ● কর্ম রহস্য ● সর্ব সাধনার সারকথা ● শ্রীশ্রীচণ্ডী ● সাধনা ● পরলোক ও পুনর্জন্মের সত্য ঘটনা ● অমৃত বাণী ● আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন ● আদর্শ নারী সুশীলা ● দেশের বর্তমান অবস্থা এবং তার পরিণাম ● গর্ভপাত করানো কি উচিত— আপনিই ভেবে দেখুন ● ওঁ নমঃ শিবায় ● নবদুর্গা ● কানাই ● গোপাল ● মোহন ● শ্রীকৃষ্ণ ● দশাবতার ● দশমহাবিদ্যা ● আত্মোন্নতি এবং সনাতন (হিন্দু) ধর্ম রক্ষার্থে কয়েকটি পালনীয় কর্তব্য ● মূলরামায়ণ ও রামরক্ষাস্তোত্র ● সৎসঙ্গের কয়েকটি সার কথা ● ঈশ্বরকে মানব কেন ? নাম জপের মহিমা ও আহার শুদ্ধি ● দুর্গতি থেকে রক্ষা পাওয়া ও গুরুতত্ত্ব ● ভক্তিসূত্র (নারদ ও শাণ্ডিল্য) ● মহাপাপ থেকে রক্ষা পাওয়া ● হনুমানচালীসা ● মূর্তিপূজা ● আনন্দের তরঙ্গ ● মাতৃশক্তির চরম অপমান ● ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব ● কল্যাণের তিনটি সহজ পন্থা ● পরমাত্মার স্বরূপ এবং প্রাপ্তি ● সুন্দরকাণ্ড ● ছবিতে চৈতন্য লীলা ● মূল্যবান কাহিনী ● সাধনার দুটি প্রধান সূত্র ● সাধনার মনোভূমি ● গীতার সারাৎসার ● অধ্যাত্ম সাধনায় কর্মহীনতা নয়। ● সন্তানের কর্তব্য